গতিহারা জাহ্নবী

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ,
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ, ১৩৪২
মূল্য দুই টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ,
আইডিয়াল প্রেস
১১।১, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গতিহারা জাহ্নবী

১

পাড়ার সবগুলি ছেলেই ভাল—এক একটি সোনারচাঁদ। প্রবোধ, শান্ত, সুধীর, গণেশ, ত্র্যম্বক, অরুণ, শশী, প্রমুখ যুবকগণ ভদ্র গৃহস্থের উপযুক্ত ছেলে; যাঁহাদের সন্তান, সন্তান সম্বন্ধে ভবিষ্যতের ভীতি তাঁহাদের নাই—

ক্ষুধা হইতে নরক পর্য্যন্ত যতগুলি দায় নিবারণ পুত্রের নিকট হইতে প্রাপ্য বলিয়া প্রত্যাশা করা যায়, উল্লিখিত ছেলেদের বাপ-মা তৎসমুদায় বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত—ছেলেরা উদ্ধার করিবেই।

কেবল মাঝখান হইতে অকিঞ্চন ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া গেল; আর তাহাই ভবিষ্যৎ হইয়া রহিল পল্লীপরিধির নিদারুণ দুশ্চিন্তার বিষয়।

গতিহারা জাহ্নবী

ছেলেরা সবাই পরস্পর সমবয়সী বন্ধু, একই দলের—যেন একই গাছের কয়েকটি ফল। কিন্তু গাছের ফল সবগুলি আকারে সমান হয় না, পুষ্টিলাভ করে না, কিন্তু স্বাদে গন্ধে তাহারা প্রায় অভেদ। এদের বেলায়ও দেখা গেল, এরা আকারে অবয়বে প্রায়ই এক, মনের বিকাশে আর উন্মুখতায় যেটুকু গরমিল ধরিতে পারা যায় তাহা প্রখর নহে, অপরিমিত নহে, অমানুষোচিত নহে, অর্থাৎ স্বাভাবিক যে পার্থক্য মানুষে মানুষে না থাকিয়া পারে না তাহাই আছে…এক অকিঞ্চন ছাড়া…

অকিঞ্চন বিকৃত হইয়া উঠিল; বন্ধুরা যেদিকে বাড়িতেছে, অকিঞ্চন কেবল যে তার উল্টা দিকেই বাড়িতে লাগিল…এমন নয়, অত্যন্ত বেয়াড়া প্রখর হইয়া মানুষের চোখ ধাঁধাইতে আর মন পুড়াইতে লাগিল।

এক শান্ত ছাড়া সকলেরই বিবাহ-ব্যাপার কবে চুকিয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ এম্নি কুটিল আর অব্যর্থ যে, লিখিয়ে-পড়িয়ে দেশের ভরসাস্থল ছেলেরা তেমন স্ত্রী লাভ করিতে পারে নাই যেমন পারিয়াছে অপদার্থ অকিঞ্চন।

প্রবোধের স্ত্রী শীর্ণা, সুধীরের স্ত্রী স্থূলাঙ্গী, গণেশের স্ত্রী কৃষ্ণকায়া, ত্র্যম্বকের স্ত্রী স্থূলমধ্যা, অরুণের স্ত্রীর চক্ষু ক্ষুদ্র…ইত্যাদি।

অকিঞ্চনের স্ত্রীর নিখুঁৎ দেহ। চন্দ্রের মত অশেষ তাহার দেহের

লাবণ্য, অঙ্গের প্রভা, মুখের শ্রী, গঠন-সুষমা তাঁহার অতুলনীয়। অত্যন্ত সচেতন মনে সেই রূপ বেশীক্ষণ দেখা যায় না···

অকিঞ্চনের বিবাহোৎসবে তাঁকও হইয়াছিল তেমনি।

কিশোরী তাহার বাপের একমাত্র কন্যা, আর রাধাবিনোদ বাবুর ধন-প্রসিদ্ধি দেশব্যাপী। কুটুম্ব-সুখ হিসাবেও এ বিবাহ যথেষ্ট সার্থক হইয়াছে। কিশোরীর পিতা রাধাবিনোদ বাবু অকিঞ্চনের পিতা জগবন্ধু বাবুর সহপাঠী ছিলেন, দু'জনায় তখন তুই-তোকারি ইয়ারকি চলিত···তারপর ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়···

তারপর ফাল্গুনের গোধূলিলগ্নে সেই পুনর্মিলন ঘটিয়াছিল অতিশয় সৌভাগ্যজ্ঞান আর সন্তোষের মাঝে। ঘটা আহ্লাদ হইয়াছিল খুবই—

কিন্তু সকল শোভা উৎসব হাসি গানের অনতিক্রম্য ঊর্দ্ধলোকে রূপের জ্যোতিঃসিংহাসনে স্থান পাইয়াছিল কিশোরী নিজে—

সম্প্রদানের পর কন্যাপক্ষীয় পুরোহিত জয়চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ—"আপনারা মাকে আশীর্ব্বাদ করুন"—বলিয়া অবগুণ্ঠন তুলিয়া ধরিতেই সভা থমকিয়া গিয়াছিল···এত কোলাহল চঞ্চলতা এক নিমিষে নিঃশব্দে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল···এবং এত সজ্জা এত আলো এত বর্ণ এত স্পন্দন অনিন্দনীয়তা অতিক্রম করিয়া সভার সম্মুখে বিরাজ করিয়াছিল আনত-আননা কন্যার মুখের সেই পেলব পুলকশ্রীটি—তাহা অনুপম।···ক্ষণেকের জন্য সকলেরই মনে হইয়াছিল, এই কন্যা ভুবনমোহিনী কমলার অবিরামবাহী আশীর্ব্বাদের যে বিত্ত মুখশ্রীতে বহন করিয়া আনিয়াছে তাহাই আমরা নতশিরে গ্রহণ করিলাম···

তারপর বোধ হয় সেই রূপের সূত্রেই কৃতজ্ঞ হৃদয় হইতে আশীর্ব্বাদ

উত্থিত হইয়াছিল,—"বধূ তুমি সুখে থাক।" তারপর আরো মনে হইয়াছিল; যাহার আচরণে এই রূপের উপর ছায়া পড়িবে তাহার অপরাধ হইবে ক্ষমার অযোগ্য।

সেদিনকার সেই বিস্মিত স্মৃতিটি, একটা আঘাতের মত, অনেকের মন হইতে আজও মুছিয়া যায় নাই···

দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল—বৌ এনেছে জগবন্ধু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঢোলের সঙ্গে কাঁসি আর সানাই বাজাইতে বাজাইতে জগবন্ধু বধূ লইয়া ঘরে ফিরিলেন···তাঁহার গৃহের যাবতীয় প্রাণী বধূ দেখিয়া পুলকিত হইল

নূতন বৌকে যেমন করা হয় তেম্‌নি কিছুদিন কিশোরী তোলা রহিল অর্থাৎ সংসারের শ্রমকর্ম্মে তাহাকে হাত দিতে দেওয়া হইল না। যৎসামান্য কয়েক ঘটী জল নিজের হাতে মাথায় ঢালিয়া স্নান করিলে কিশোরীর যেন দৈহিক কষ্টের আর মনোবেদনার সীমা থাকিবে না, আর, তাহার পাতাল-প্রবেশ ঘটিবেই—আর, তাহার জন্যই জগবন্ধুর বাড়ীর রমণীগণকে চিরদিনের জন্য যেন অপরাধী হইয়া থাকিতে হইবে, এম্‌নি তাদের হৈ হৈ চীৎকার আর সেবাকুলতা।

এদিকে তাসের আড্ডায়, গল্পের মজ্‌লিসে, গানের বৈঠকে

অকিঞ্চনের তিলমাত্র বিশ্রাম নাই, তাহাকে কেবলি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।

কিন্তু স্ত্রীর রূপ-যৌবন সম্বন্ধে অকিঞ্চনের যেন বদ্ধমূল কোনো ধারণাই নাই…তাই যখন প্রশ্নের উত্তরে সে বলে, "কি জানি, ভাই, ভাল ক'রে চেয়ে দেখিনি"…কিম্বা, "জানিনে ভালবেসেছে কিনা"…তখন তার বন্ধুরা খানিক হাসে, খানিক অবাক্ হইয়া থাকে…অকিঞ্চনের গা-আল্‌গা নিঃস্পৃহা দেখিয়া তারা মনে মনে বলে,—'বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার!'…অকিঞ্চনের তরফ হইতে স্ত্রীর সম্বন্ধে একটা প্রবল উল্লাস আর উচ্ছ্বাস দেখিবার আশা করিয়া তারা কথাটা তোলে… প্রশ্নের মধ্যে তাদের নিজেদেরই একটা সূক্ষ্মতম অভাবের অনুভূতি যেন তৃপ্তি খুঁজিয়া বেড়ায়…কিন্তু অকিঞ্চনের সম্বিৎ নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের মত, থাকিয়াও নাই… পৃথিবীর জীবনের জীবন যেরূপ সেই রূপের নাগাল পাইয়াও সে যেন উন্মীলিত চক্ষুর দৃষ্টির দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহে না…

বন্ধুরা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়—

কল্পনায় নিজেকে কিশোরীর মত সুন্দরীর প্রিয়তম রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঈর্ষায় তাহাদের অনন্ত গাত্রদাহ ধরিয়া যায়।…ঐ আলোচনাতেই যে হর্ষদীপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তির রেখা মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিবার কথা, তাহাকে প্রাণপণে গোপন রাখিবার আকাঙ্ক্ষারই নাম সুখ. কিন্তু অকিঞ্চনের ভাবগতিক দেখিয়া উহাদের মনে হয়, কিশোরী তার স্বামীর নীরস মর্ম্ম আর ভাববস্তুহীন বর্ব্বরারণ্যে নির্ব্বাসিতা হইয়াছে…

তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়া ও-প্রসঙ্গ ত্যাগ করে—কাহারও নিঃশ্বাস পড়ে।

কিশোরীর আগমনে জগবন্ধুর অন্তঃপুরের শ্রী ফিরিয়া গেছে। অপরিচ্ছন্নতা আগেও ছিল না, এখনও নাই ; কিন্তু তাহারও অতিরিক্ত একটা স্থানে সবারই অন্তরসত্তার অস্বচ্ছতা কাটিয়া যেন শরৎ-জ্যোৎস্নার মিলন-আগমনীর একটা সুনির্ম্মল মিষ্ট সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। কিশোরীর সর্ব্বাঙ্গে শরৎ-লক্ষ্মীর ঝলমল দীপ্ত শ্রী—অতুল আলোক আর ভরণাভরণের সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়া সে যেন জগদ্ধাত্রীর মত পূজার পাত্রী।

শাশুড়ী বলেন, বৌমা আমার লক্ষ্মী।

কথাটা সত্য—শুধু রূপে নয়, গুণেও। কিশোরী মুখের হাসি কি হাতের স্পর্শ দিলেই তুচ্ছতম বাক্যটি আর বস্তুটি সম্পদে বর্ণে অতুলনীয় হইয়া উঠে। যাহা এতদিন মানুষের দৃষ্টি এড়াইয়া গেছে, কিশোরীর গুণে তাহাই এখন অপূর্ব্ব হইয়া দেখা দিতে লাগিল।

ছেলেরা কিশোরীর সঙ্গে এক থালায় ভাত খাইবার জন্য ঝগড়া করে···কিশোরী ভাতে হাত দিলে সেই ভাতের স্বাদ নাকি ভাল হয়।

এম্‌নি তাহাকে লইয়া কাড়াকাড়ি।

কিন্তু অকিঞ্চন সে সব কিছু বোঝে না। মনের কোন্ কথাটা আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে বেশী করিয়া ফোটে, কোন্ কথাটার জবাব দিতে গিয়া সেই কথাটাই ভুলিয়া যাইতে হয়, কোথায় অকারণ কথাটাই গোপন কারণে ভরপুর হইয়া দেখা দেয়—এইসব

নিগূঢ় ব্যাপার ঘটোৎকচের শাস্ত্রজ্ঞানের মত অকিঞ্চনের অন্তর্লোকের একেবারে বাহিরে। তার মনে যেমন ক্রীড়াশীলতা নাই, তেমনি ব্রীড়াময়তাও নাই, উহাদের অভাবে সে অন্ধ।

শয্যার ধার ঘেঁসিয়া কিশোরী শুইয়া থাকে—কেবল তার পদতল দু'টি শয্যার প্রান্তে দেখা যায়, আর সব আবৃত; কিন্তু তার পা দু'খানির দিকে অকিঞ্চন চাহিয়াও দেখে না···কোনো সূত্রেই এ কথাটা তার মনে পড়ে না যে ঐ আবরণের নীচে যে আড় হইয়া শুইয়া আছে সে মনে মনে চুপ্ করিয়া নাই···খনিতে হীরার মত তার সুকুমার হৃদয়-আধারে সুকোমল কত স্বপ্নের মুহুর্মুহুঃ উদ্গম আর স্বপ্নে স্বপ্নে বিজড়ন ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই

কত কথা সে মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছে—

প্রভাত হইতে এখন পর্য্যন্ত মনে মনে সে কত প্রশ্ন সৃষ্টি করিয়া তার কত উত্তর সাজাইয়া সাজাইয়া, ভাঙ্গিয়া আবার গড়িয়া কত হাসি হাসিয়াছে···আর সেই প্রশ্নোত্তরের জটিল গ্রন্থিমালার দিকে চাহিয়াই তার মন দু'চোখ মেলিয়া জাগিয়া বসিয়া আছে···

অকিঞ্চনের মনে আসে না, সে তাহারই প্রিয়তম। প্রিয়তমার অভিসারের পদধ্বনি তার কানে পৌঁছায় না···কিশোরী দিবাস্বপ্নে অভিসারে যাত্রা করিয়া নীরব নিভৃত নিশীথ রাত্রে তার একান্ত সন্নিকটে আগমন করে···কুঞ্জে কুঞ্জে সে কুসুম বিকশিত দেখে···কল্পনায় অকিঞ্চন তাহা দেখিতে পায় না···প্রতীক্ষায় মর্ম্ম উদ্ঘাটিত করিবার মত সূক্ষ্ম রসবোধ তার নাই।

অকিঞ্চন চুপ করিয়া শুইয়া পড়ে—চিৎ হইয়া উর্দ্ধদিকে চোখ

রাখিয়া বলে,—তোমার দাদা বিদ্যে জাহির করবার আর স্থান পেলেন না; বিদ্যে ফলিয়ে ইংরেজীতে লিখেছেন আমাকে। আরে ইংরিজী আমরাও জানি···বলিয়া সিগারেট ধরায়।

স্বামী ইংরিজী জানেন এ সুসংবাদে সুখ বোধ করিবার বয়স কিশোরীর হইলেও কেবল সেই সুখটীকেই অনন্যশরণ হইয়া উপভোগ করিবার সময় সেটা নয়। নিজের ইংরিজী জানার খবরটা এত আক্রোশ-সহকারে দিবার কারণ না বুঝিতে পারিয়া কিশোরীর বুক দুরু দুরু করে···

সে ত জানে না যে, ইংরিজী-জানা এই মানুষটি ইংরিজী জানা-না-জানা উপলক্ষে অত্যন্ত অপদস্থ হইয়াছে—আজই। আড়ম্বর করিয়া সে শ্যালকের পত্র লইয়া বন্ধুবর্গকে দেখাইতে গিয়াছিল—তখন নব-কুটুম্বের অকারণ বিদ্যা জাহিরের ধৃষ্টতায় অকিঞ্চনের অপ্রসন্নতার কারণ ঘটে নাই বরং নিজের লোক হিসাবে সে গর্ব্বই অনুভব করিয়াছিল—

কিন্তু কে জানিত বন্ধুরা ইংরিজী পত্র দেখিয়া বিস্মিত এবং সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাদের সমক্ষে সেই পত্র পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিতে তাহাকেই বলিবে, এবং সে তাহা পারিবে না!

তাহা সে পারে নাই দেখিয়া বন্ধুরা বলিয়াছিল, "কী বলেছিলি শ্বশুর-বাড়ীতে?"

—কিসের কথা?

—ইংরিজী জানার কথা।

—কিছুই বলিনি!

—তবে ভদ্দর লোক ভুল ক'রলেন কেন?

—তা' তিনিই জানেন!

—তবে ফেরৎ পাঠিয়ে দে এ-চিঠি তাঁর কাছে, আর লিখে দে; 'গোটা গোটা অক্ষরে বাংলা ক'রে পাঠাও'...

এটুকু শুনিয়াই এবং বাকি বক্তব্য না শুনিয়াই অকিঞ্চন শ্যালকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল—এবং কৃতবিদ্য আপনার লোক বলিয়াও শ্যালকের প্রতি তার মার্জ্জনার ভাব এখন পর্য্যন্ত নাই।

কিশোরীর সঙ্গে উগ্রতর এবং সাময়িক কথা বিশেষ কিছু নাই—সুতরাং শ্যালকের উপর রাগ করিয়া শ্যালকের ভগিনীকে ইংরিজী-জানার কথাটা সে জোরের সহিতই জানাইল...

খানিক্ হুস হুস্ করিয়া সিগারেট টানিয়া অকিঞ্চন অনতিপুরাতন স্মৃতির জগৎ হইতে এবার অন্য কথা আনিয়া বলিল। কথাটা সুখদ; বলিল,—বাসর-ঘরে তোমার ঠিক্ বাঁ পাশেই যে মেয়েটি বসে' ছিল সে কে?

খবর হিসাবে কিশোরী বলিল,—আমার সই।

– তা' হ'লে ত' আমারও সই।...হালি বিয়ে হয়েছে বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তোমার বড় না ছোট?

—সে আর আমি দু'মাসের ছোট-বড়। —সেই বড়।

অকিঞ্চন আর প্রশ্ন করে না; বলিয়া বসে,—বেশ চোখ দু'টি!

অপরার চোখ দু'টি বাস্তবিকই ভাল...

গল্পচ্ছলে বা প্রশংসাচ্ছলে ভাল চোখকে ভাল বলা নিশ্চয়ই অবৈধ নয়—সে চোখ পর-স্ত্রীর হইলেও। কিন্তু অকিঞ্চনের কণ্ঠস্বরে কি যেন

ছিল, কিশোরীর চোখ তাহাতেই সজল হইয়া উঠিতে চাহিল। কিশোরী অকিঞ্চনের মুখ দেখিতে পায় নাই···কল্পনায় পর-স্ত্রীর অঙ্গ ঘনিষ্ঠতার সহিত স্পর্শ করিতে থাকিলে মুখের চেহারা কেমন হয় তাহা কিশোরীর চোখে পড়িল না, কিন্তু যে সুরে চোখের প্রশংসা উচ্চারিত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট—সে সুরে যেন প্রাণ আছে—সে প্রাণ তৃষ্ণাতুর।

কিশোরী কথা কহে না—

উত্তর যে পায় নাই তাহা অকিঞ্চনের মনেও থাকে না—সে বিভোর হইয়া ভাবে সেই মেয়েটির কথা—হাসি-কৌতুকে ঝল্‌মল্‌, আর চমৎকার তার চক্ষু দু'টি। ইহার অর্থাৎ স্ত্রী কিশোরীর বর্ণ উজ্জ্বল বেশী, তাহাতে অসাধারণত্ব কিছু নাই, কিন্তু তার অর্থাৎ স্ত্রীর সই অপরার চক্ষু দু'টি অতি কোমল, ঢল ঢল—এমন অসাধারণ যে, এই শহরে, কই, তেমনটি ত' দেখা যায় না।···অকিঞ্চনের ক্ষোভ জন্মে। এ অর্থাৎ কিশোরী ত' আছেই, একেবারেই পরের হইয়া গেল, একদিনের জন্যও কেন তার হইল না! অকিঞ্চনের জীবনে বিতৃষ্ণা ধরিয়া যায়; মনে হয়, তাহাকে এখনই যদি কেহ জবাই করে তবে দুঃখ নাই।

—রাত্তিরে কি গল্প হ'ল বৌয়ের সঙ্গে বল্।—বলিয়া সুধীর, শান্ত এরা সব অকিঞ্চনকে ধরিয়া বসে।

অকিঞ্চন ভ্রূ-ভঙ্গী করে, বলে,—কথার জবাবই পাইনে তা' গল্প কি ক'রব!

সুধীর হাসিয়া বলে,—কি কথার জবাব পাস্‌নি ?

অকিঞ্চন তখন সেই মেয়েটীর কথা বলে—যে তার স্ত্রীর সই, আর যার নাম অপরা—আর যার চোখের কথা ভোলা যাইতেছে না··· অকিঞ্চন তার মনের কথা এমন করিয়া লালসা দিয়া ফলাইয়া গাল ভরিয়া বলে যেন কিশোরীর সঙ্গে বিবাহ না হইয়া সেই মেয়েটীর সঙ্গে বিবাহ হইলেই আক্ষেপের কিছু থাকিত না।

শুনিয়া শান্ত বলে,—অজরাজ !

অরুণ বলে,—ছিঃ, শান্ত! অজরাজ বলিসনে ওকে।

অকিঞ্চন জিজ্ঞাসা করে, অজরাজ মানে কি ?

—পাঁঠা-প্রধান।

—কেন কেন, পাঁঠা কেন ?

—বুদ্ধিতে আর আদিরসে।···ওদের প্রাণে কি ওকথা সয় !

—সওয়াতে জান্‌লেই সয়। বলিয়া অকিঞ্চন এমন বিশ্বকর্ম্মা ভাব দেখায় যেন মানুষকে দিয়া সহ্য করাইবার আশ্চর্য্য কারখানাটী তারই তাঁবে।

কিন্তু অকিঞ্চন একেবারে তাজ্জব হইয়া গেল, ঘুণাক্ষরেও সে ভাবে নাই যে, তাহার কেবল ঐ কথাটাতেই সমগ্র পাড়াটাই এমন রে রে করিয়া উঠিবে।

সেই দিনই স্থানান্তরে এই প্রসঙ্গেরই পুনরালোচনা হইতে দেখা গেল।

অকিঞ্চনের বন্ধু সুধীরও নব-বিবাহিত--নব এই হিসাবে যে বিবাহ করা উচিত হইয়াছে কিনা এ প্রশ্ন এখনও তার মনে ওঠে নাই। আর

সে অপরার চোখে এমন কিছু দেখে নাই যে স্ত্রীকে সরাইয়া দিয়া অপরূপ নয়নাকে সম্মুখে বসাইয়া রাখিবে। অকিঞ্চন স্ত্রী পাইয়াছে অদ্বিতীয়া সুন্দরী। তার উপর চোখের দরুণ স্ত্রীর সইকে ফাউ-স্বরূপে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা অকিঞ্চনের পক্ষে বাতুলতা না হোক মানুষের পক্ষে গল্পের বিষয় বটে।

সুধীর বলিল—আমাদের বন্ধুটি বড় রসিক লোক!

—কার কথা বলছ?

—অকিঞ্চনের কথা। বাসর-ঘরে তার স্ত্রীর সইকে সে দেখে এসেছে...বলিয়া সুধীর হাসিল।

দেখাতেই যে দেখা শেষ হইয়া যায় নাই অম্বা তাহা বুঝিল, বলিল,—বলছিলেন নাকি?

—হ্যাঁ।

—তারপর?—

—তারপর আর কি! মন পড়ে' আছে সেখানে। অকিঞ্চন মন খুইয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

এই কথারই প্রতিধ্বনি লইয়া অম্বা আসিল কিশোরীর কাছে... কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল,—সইটা কে, ভাই?

প্রশ্নটি শুধুই কৌতুক—

কিন্তু কিশোরী চমকিয়া মুখ টানিয়া লইল। অম্বার ঐ তরল প্রশ্নে অনধিকারের অপরাধ বোধ হয় ছিল, কিন্তু সেটা তেমন মর্ম্মান্তিক কথা নয়। কিশোরীর মন পূর্ব্ব হইতেই ঐ সম্পর্কে বেদনায় ভরাক্রান্ত ছিল বলিয়া কৌতুকটা সহ্য করিতে পারিল না। কথাটা রাষ্ট্র হইয়া

গিয়াছে ; পরিহাস কৌতূহল হাসি টিট্‌কারীর সৃষ্টি করিয়াছে, এ সব কঠিনই বটে ; যেখানে বেদনা সঞ্চিত হইয়া আছে সেখানে এ কথা সহে না…

তার উপর, এই কথার মধ্যে তার নিজের স্থানটি অধঃস্থলে, যেন একটা নিষিদ্ধ স্থানে। এই সব মনে হইয়া কিশোরী অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিল…

এবং সঙ্কট গুরুতর হইয়া উঠিল এই কারণে যে, কিশোরীর এই অশ্রু-সঙ্কটের সময় শাশুড়ী কাত্যায়নী ঘটনাস্থলে আসিয়া দেখা দিলেন এবং জানিতে চাহিলেন, বধূর এই অশ্রুপাতের কারণ কি ?

জানিতে চাহিয়া তিনি অম্বাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অম্বা থতমত খাইয়া প্রথমে কিছুই বলিতে পারিল না, কিন্তু কাত্যায়নী তাহাকে ছাড়িলেন না…এবং তাঁহারই তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর প্রশ্নমালার উত্তরপরম্পরায় অম্বা সমুদয় কাহিনী উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল…

শুনিয়া কাত্যায়নীর ধৈর্য্যচ্যুতি আর কণ্ঠনিনাদ একই সঙ্গে না ঘটিয়া পারে নাই। অবশ্য অম্বাকে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি কিছু বলিলেন না…সাধারণ ভাবে জানিতে চাহিলেন, পাড়ার বৌঝিদের পরের ব্যথায় এই মাথা টিপ্ টিপ্—ইহা কিসের জন্য ? নিজের নিজের কর্ম্ম লইয়া সন্তুষ্ট থাকাই কি তাহাদের কর্ত্তব্য নহে ? এবং তাহার ব্যতিক্রম কি অতিশয় ঘৃণ্য নির্লজ্জতা নহে ?

এমনি আরও কত প্রশ্ন কাত্যায়নী করিলেন ; কিন্তু তার একটিরও জবাব না-থাকায় অম্বা পলাইবার পথ পায় নাই…

গতিহারা জাহ্নবী

এবং তারপরই দেখা গেল, কথাটা পল্লবিত হইতে হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই হাওয়ার মুখে মেঘের মত চারিদিকেই ছড়াইয়া গিয়াছে।

হরিপ্রিয়া বিগত পরশ্ব এক বাটি সর্ষপ তৈল কর্জ্জ লইয়া গিয়াছিলেন—ঐ কথাটা শুনিবার পরই তাঁর মনে হইল, ঋণ পরিশোধ অবিলম্বেই করিতে হইবে। তিনি অন্য বাড়ী হইতে সেই বাটির আর এক বাটি তেল কর্জ্জ করিয়া পূর্ব্বের ঋণ পরিশোধ করিতে আসিছেন···আসিয়া কাত্যায়নীর রান্নাঘরের সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন···বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—ভাবলাম, কবে নিয়ে গেছি তেল এক বাটি, দেবার নামটি করিনে। তেলওয়ালা মিন্‌সে আজ আস্‌তেই ভাবলাম, দিয়ে আসি কাতুর তেলটুকু এখুনি···

বলিয়া নীরব হইলেন—

কাত্যায়নী বলিলেন—বেশ করেছেন। বলিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিলেন; কিন্তু তাঁর চোখের সঙ্গে হরিপ্রিয়ার চোখের মিলন হইল না—হইলে হরিপ্রিয়া স্পষ্টই দেখিতে পাইতেন, ঋণ-পরিশোধ-সম্পর্কে ত্বরান্বিতা ঋণীকে আপ্যায়িত করিবার আগ্রহ আপাততঃ উত্তমর্ণের নাই···কড়াইয়ে তেল, আর সে কড়াই আগুনের উপর···

তেলের ভিতর জলো' তরকারী ছ্যাঁক্‌ শব্দ করিতে লাগিল...

কাত্যায়নীর হিতার্থে হরিপ্রিয়া পুনরায় বলিলেন,—তেলটুকু তোল্‌ বোন, এখুনি কাগে মুখ দেবে—তোলো।

—তুলি। বলিয়া কাত্যায়নী তাড়াতাড়ি হরিপ্রিয়ার বাটির তেল নিজের পাত্রে ঢালিয়া লইয়া কড়াইয়ের অভ্যন্তর-সম্পর্কে নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন…

অর্থাৎ হরিপ্রিয়ার মনের কথা তিনি টের পাইয়াছেন। হরিপ্রিয়া বারোয়ারী হিতার্থিনী—আর, মানুষের কুৎসিত আচরণ তাঁর সহ্য হয় না, এবং সেইটাকে কায়মনোবাক্যে বাধা দেওয়া ছাড়া ভালবাসা জানাইবার অন্য উপায় তাঁর জানা নাই।

হরিপ্রিয়া বিধবা; কবে তিনি বিধবা হইয়া ফিরিয়' আসিয়াছেন তাহা কেহ জানে না; কিন্তু সবাই জানে চির-দুঃখের এই কথাটাই যে কেবল সেকেলে বিধবা বলিয়াই তিনি সুবিমল পবিত্রতার আর কঠোরতম স্পষ্ট কথা ও বিচারনিষ্ঠার যে কোঠায় পৌঁছিয়া গেছেন সেখানে তাঁর. আসন মণি-নির্ম্মিত আর তাহা অনশ্বর। চুল তিনি খুব খাটো করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছেন—সেই দিকে আর তাঁর নিষ্কম্প চোখের দিকে চাহিয়া বুক না কাঁপে এমন বৌ ঝি দেশে নাই।

বলা বাহুল্য, হরিপ্রিয়া ইহাদেরও হিতার্থিনী, খুবই ভালবাসেন—

সুতরাং তেলটুকু নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়াছে দেখিয়াও কাজ শেষ হইয়াছে বলিয়া তাঁর মনে হইল না; দূরত্ব-নিবন্ধন অসুবিধা বোধ করিয়া তিনি আর একটু আগাইয়া চৌকাঠের উপর উঠিয়া বসিলেন…শূদ্রের থালা বাটি কিছু ছুঁইয়া না ফেলেন সে বিষয়ে সতর্ক হইয়া এবং চারিদিকে চাহিয়া লইয়া হিতবাক্যের সূত্রপাত করিলেন; বলিলেন,—এ কি দিনকাল এল, কাতু!

যেন দিনের পর দিন যত যাইতেছে চেহারা তার ততই বিশ্রী হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু কাত্যায়নী তখন মরিয়া হইয়া তরকারী ঘুঁটিতেছিল...

উত্তরের জন্য একটু থামিয়া হরিপ্রিয়া বলিতে লাগিলেন,—কথাটা বলতেও পারিনে, না বলেও পারিনে—সত্যি কি মিথ্যে তা' ঈশ্বর জানেন।...শুন্‌লাম, ছেলে নাকি বাসরঘরে কাকে দেখে ভালবেসেছে ?...বলিতে বলিতে দিনকালের দুর্ভাবনায় তাঁর মুখ কালি হইয়া উঠিল, কি যে স্পষ্ট কথাগুলি না ফুটিতে পাইয়া বুকের ভিতর ছট্‌ফট্ করিতেছিল তাহারাই তাঁহার দম্ ফাটাইতে লাগিল, তাহা করিতে লাগিল কেবল তাঁরই প্রাণ...

কাত্যায়নী কড়াইয়ের ভিতর হইতে চোখ তুলিতে পারিলেন না ; কিন্তু তাঁর মনে হইল, কড়াইভরা এই ফুটন্ত তরকারী ঐ দুশ্চিন্তান্বিতার মাথায় ঢালিয়া দিতে পারিলেই যেন অবস্থার উপযুক্ত ব্যবস্থা অর্থাৎ সকল সমস্যা আর তর্কের যথোচিত অবসান হয়।...কাত্যায়নী তবু স্বাভাবিকভাবেই বলিলেন—তোমার সে কথায় কাজ কি দিদি ? আর, ছেলে কাকে ভালবেসেছে তা-ই বা তুমি জান্‌লে কি ক'রে ! বৌকে সে শুধিয়েছিল তার সইয়ের কথা।

মণি-নির্ম্মিত যে আসনে মানুষের সম্মতিক্রমে হরিপ্রিয়া বসিয়াছেন এবং চিরকাল বসিয়া আছেন, মনে মনে সেই আসনের উপর তিনি উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন—"কাত্যায়নী ঘটনা গোপন করিতেছেন।... যে চৌকাঠের উপর তিনি আসন লইয়াছিলেন সেখানে তিনি একটু নড়িয়া বসিলেন ; বলিলেন—আমিও ত তা-ই বলি। অকিঞ্চন ত তেমন ছেলে নয়। কিন্তু লোকে যে বড় বলছে, বোন্ ; বড় কুৎসো করছে !

—করুলে আর কি করব বল? তুমিও ত লোকেরই একজন! অকিঞ্চন তেমন ছেলে নয় যদি জানো তবে করুক না লোকে কুৎসো—তুমি চুপ ক'রে থাক্‌লেই পার্‌তে!

আরো ঢের কথা কাত্যায়নী বলিতে পারিতেন; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত বলিয়াই তাঁর দ্বিতীয়বার ধৈর্য্যচ্যুতি আর কণ্ঠনিনাদ একসঙ্গে ঘটিবার উপক্রম হইতেই তিনি মুখ ফিরাইয়া হরিপ্রিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া ঢোক গিলিয়া—অবশ্য হরিপ্রিয়ার ভয়ে নয়, ব্যাপার নিজেরই গার্হস্থ্য এবং কুৎসিত বলিয়া, থামিয়া গেলেন…

এবং তাঁর চোখে মনের যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল তাহাতেই যথেষ্ট কাজ হইল—

হরিপ্রিয়ার সেই আসনে যেন আগুন ধরিয়া গেল—তিনি উঠিলেন… যতই তিনি প্রচণ্ডা হিতার্থিনী হউন যাহার হিত তিনি কামনা করেন তাহার বাড়ীতে বসিয়া মেজাজের খারাপ দিক্‌টা দেখান' তিনি পছন্দ করেন না—যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে বিপক্ষের গৃহ অনিরাপদ দুর্ব্বল দুর্গ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস…

সুতরাং তিনি উঠিলেন; বলিলেন,—যাই বোন্ এখন! তেলটুকু দিয়ে বাঁচলাম। আমাদের কি ধার সয়!—বলিয়া হরিপ্রিয়া সসম্মানে বিদায়-সম্ভাষণ করিলেন, এবং অকারণেই এদিকওদিক চাহিয়া ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া দরজা গলিয়া অক্লেশে বাহির হইয়া গেলেন…

এবং তারপরই দেখা গেল, মূল কথাটা অধিকতর পল্লবিত এবং পত্রোল্লাসে অধিকতর রম্য হইয়া রটিতে রটিতে এইরূপ কমনীয় আকার ধারণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে…

অকিঞ্চন বাসর-ঘরে পরের মেয়ের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল ; তাহার ফলে প্রহার খাইতে খাইতে কেবল বাসরঘরের জামাই বলিয়াই এবং মেয়ের বাবা তার বাবার বিশেষ বন্ধু বলিয়াই, খায় নাই···সেই মেয়েটীর ধারাল নখের দাগ অকিঞ্চনের ডান হাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে...ইত্যাদি।

গ্লানিকর এ অবস্থায় অপর লোকের বোধ হয় মাথা হেঁট হইয়া যাইত, কিন্তু অকিঞ্চনের সবই বিপরীত—তার পুলক স্ফূর্ত্তি দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল···

অকিঞ্চন বলে—"এই দেখ তার কামড়ের দাগ"—বলিয়া আড়ম্বর করিয়া সেকালের একটা কাটা দাগ মানুষকে ডাকিয়া দেখায়, আর দাঁত মেলিয়া হ্যা হ্যা করিয়া হাসে...

পাড়ার বনেদি ঠান্‌দিকেও দাগটা সে দেখাইল···

ঠান্‌দি বলিলেন—দূর শালা বেহায়া !

অকিঞ্চন বলিল—তুমি ত বেটাছেলে নও ; বেহায়া-পনার মজা তুমি বুঝ্‌বে কি?···বলিয়া চোখ ঠারিল—যেন অতীত হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত বেহায়াপনার গৌরব তার অদৃষ্টের হিসাবের খাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে ; আর, ভবিষ্যতের কাছেও এই গৌরবের সমর্থন তার প্রাপ্য।

সে যে কুৎসার পাত্র, জঘন্য দুর্নামের লক্ষ্য, ইহার লজ্জা অকিঞ্চনকে স্পর্শও করিল না। সে যে নিদারুণ অপমানিত হইয়া আসিয়াছে ইহা মিথ্যাই, কিন্তু মিথ্যাটাই লোকের মুখে বিচরণ করিতে করিতে যখন তার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও আর সন্দেহ রহিল

না তখন দেখা গেল, উত্তরোত্তর আনন্দের মাত্রা বাড়িয়া অকিঞ্চনের কলেবর যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে···

যে কারণে তাহা ঘটিল তাহা যেমন কদর্য্য তেমনি গভীর। যাহার সঙ্গে তাহাকে জড়াইয়া এই আলোড়ন সুরু হইয়াছে সে পরনারী। অপবাদের মাঝেই শুধু নামের সূত্রেই অকিঞ্চনের দেহ আর মনের পরনারী-লোলুপতা একপ্রকার তৃপ্তিলাভ করে...

অকিঞ্চনের আব্‌হাওয়ার স্তরে ঝটিকার কলরব যতই থাক্ তাহা আনন্দও দেয় বই কি—কিন্তু তাহা অন্যত্র; আজ গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহা একজনকে নির্ম্মম আঘাত করিল।

খাটে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে অকিঞ্চন বলিল,—একটা পান দাও দিকি। তুমি পান সাজো বেশ।

কিশোরী তখন পানই সাজিতেছিল—মাথা হেঁট করিয়া তখনই সে পানের দিকে তাকাইয়া সদ্যসাজা পানে একটি লবঙ্গ গুঁজিয়া দিল—একটি রৌদ্ররেখা উর্দ্ধের ক্ষুদ্র একটি ছিদ্রপথে অবতরণ করিয়া কিশোরীর কানের দুলের উপর পড়িয়াছে—দুলের মৃদু আন্দোলনে দুলের অপরূপ রৌদ্রদ্যুতি যেন ছিট্‌কাইয়া চোখে আসিয়া পড়ে—

কিন্তু অকিঞ্চন তখন অন্য চিন্তায় বিভোর—বলিল,—দাও একটা পান। এমন পান কেউ সাজতে পারে না।

কতস্থানের পানের স্বাদের অভিজ্ঞতা অকিঞ্চনের আছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

কিশোরী পানটি হাতে করিয়া উঠিয়া আসিয়া অকিঞ্চনের হাতে দিল—

থপ্ করিয়া পানটি গালে পূরিয়া অকিঞ্চন বলিল,—শুনছ সব লোকের কথা ?

নূতন বৌয়ের সর্ব্বদাই ভয়, পাছে লোকে কিছু বলে ; কিশোরী মনে মনে হঠাৎ চমকিয়া উঠিল···কিন্তু সত্বরই প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, লোকের কথা তাহার সম্পর্কে নয়—

অকিঞ্চন বলিতে লাগিল,—তোমার সইকে না কি আমি বে-ইজ্জত ক'রে এসেছি—লোকে তাই বলছে। হি হি হি···। অকিঞ্চন মাথা নাড়িয়া হি হি করিয়া অকাতরে অনর্গল হাসিতে লাগিল—যেন, এই অলৌকিক খ্যাতির গৌরব রাখিবার ঠাঁই তার নাই ; আর ধর্ম্মপত্নীকে সেই গৌরবের ন্যায্য অংশে বঞ্চিত না করিয়া তাহাকে তাহা দিতেই হইবে।

কিশোরী তার নিবিড় কালো চক্ষু দুটি মেলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল...অপার লজ্জায় আর বেদনায় উদভ্রান্ত হইয়া সম্বিৎ তার স্বামীকে এবং তার নিজেকেও অতিক্রম করিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল তাহা কেউ জানে না।

অকিঞ্চন বলিতে লাগিল,—মাইরি, লোকের আক্কেল দেখ ! বিয়ের রেতে—

কিন্তু হঠাৎ বাধা পাইয়া তাহাকে থামিয়া যাইতে হইল···কিশোরী বসিয়া পড়িয়া দু'হাত দিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, চুপ্ করো, তোমার পায়ে ধরছি।···বলিয়া কিশোরী যখন কাঁদিয়া ফেলিল তখনও অকিঞ্চন কিন্তু হাসিতেছে !

অকিঞ্চনের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই নিছক হাসি-মস্করা-তামাসার কথা, কথাটার শেল কোথায় তাহা তার জানা নাই।

গতিহারা জাহ্নবী

বাটার উপর হইতে আর একটা পান অত্যন্ত বিলাসভরে তুলিয়া লইয়া অকিঞ্চন ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

কিশোরী বাপের বাড়ী যাইবে অকিঞ্চনের সঙ্গে। তাহাতে এদিকে দেখা গেল অকিঞ্চনের যেমন সাজ-সজ্জার আহ্লাদ আর আয়োজন, ওদিকে দেখা গেল তেমনি কত্যায়নী প্রভৃতির মনোবেদনা আর চোখের জল।···মায়ের কাছে দুরন্ত আব্দার করিয়া অকিঞ্চন আরো দুটি জামা, একজোড়া সেলিম-শু, একজোড়া মোজা, খান চারেক রুমাল, শিশি দুই এসেন্সের জন্য টাকা আদায় করিয়া লইয়াছে।

আসিবার সময় কিশোরীকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিয়াছিলেন—যেমন সকল মশা-ই বলে—যে, শাশুড়ীর সেবা করিস্, বুঝে' সুঝে' চলিস্; যেন তোর নিন্দে শুন্‌তে না হয়···ইত্যাদি।

কিশোরী মশায়ের ইচ্ছা কায়মনোবাক্যে পালন করিয়াছে—কাহারো সেবায় সে ত্রুটি করে নাই। সেবায় বনের পশুও বশীভূত হয়, কাত্যায়নীও হইয়াছেন—সেবা পাইয়া তিনি পুত্রবধূকে ভালবাসিয়াছেন, কিশোরীর যাইবার কথায় তা-ই তাঁহার চোখের জল বারণ মানিতেছে না···।

কিন্তু কিশোরীর তরফের যে কথাটি ঘুণাক্ষরেও কেউ জানে না তাহা এই যে, স্বামীর সঙ্গে এখনই পিতৃগৃহে যাইতে তাহার আদৌ উৎসাহ নাই···তার বুকে অন্তঃস্রোতে বহিতেছে দুঃসহ একটি শঙ্কা—তার সেই সই এখনও সেখানেই আছে।

স্বামীকে চিনিতে তার বাকি নাই—

বুদ্ধি আর লজ্জা অতিশয় অল্প···সইয়ের প্রতি তাঁর অমার্জ্জ-

নীয় লুব্ধতা কখন গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাইবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহা অনুমান করিবার উপায় যেন নাই···তিনিও কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া নিজেকে সংযত রাখিবেন কিনা তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত যেন নয়—না রাখিবার দিকেই যেন ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। লোক-চক্ষুর সম্মুখে স্বামীর ইতরতা যদি উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে!···তখন সে কি করিবে! চিন্তাটাই যে সহ্য হয় না।

পরশুই সইয়ের চিঠি লইয়া অকিঞ্চন যে কাণ্ডটা করিয়াছে তাহা মনে করিতেই কিশোরীর গা ঘিন্ ঘিন্ করে।···চিঠির সমাপ্তিতে ছিল—"তোর অপরা।"

অকিঞ্চন "তোর অপরা" শব্দ দুটি সশব্দে উচ্চারণ করিয়া প্রায় মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দ হইয়া অসাড়ের মত পড়িয়া ছিল···চিঠিখানা ছিল তার বুকের উপর নামান'। অকিঞ্চনের সেই স্পন্দহীন সময়টুকু মানসিক কোন্ বিলাসে অতিবাহিত হইয়াছিল, কিশোরীর গভীরতম সংজ্ঞাটি তাহা অনুভব করিয়াছে। কিশোরী তখন বিদ্ধ হইয়াছিল।

বলি বলি করিয়া বহুক্ষণ সঙ্কোচ লজ্জার নির্য্যাতন ভোগ করিয়া কিশোরী এক সময় কাত্যায়নীকে বলিল,—এখন আমি যাব না মা, কিছুদিন পরে যাব।

বধূর ইচ্ছা শুনিয়া কাত্যায়নী বিগলিত হইয়া গেলেন—

আপন ঘরের বাঁধনের এম্‌নি আঁটই বটে!

পরম মমতার সহিত তিনি কিশোরীর চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন; কিন্তু বলিলেন,—তোমার মাকে যে চিঠি লিখে দিয়েছি, মা! এখন ত' না যাওয়া হয় না।

বলিয়া তাঁহার আর তর্ সহিল না—

সু-খবরটি দিতে স্বামীকে তিনি তখনই ডাকিয়া পাঠাইলেন··· বলিলেন,—শুনেছ তোমার বৌমার কথা!···বল্‌ছে, এখনই বাপের বাড়ী যাব না; দিনকতক পরে যাব।

—কেন? বলিয়া জগবন্ধুটাকে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন!

—তা' জানিনে, বল্‌ছে তাই।—তারপর স্বর নামাইয়া কাত্যায়নী বলিলেন,—আজকালকার মেয়েরা আপন ঘর চিনেই আসে। আমাদের সে-দিন আর নেই।—বলিয়া বিগত কালের মেয়েদের তুল্য ব্যাপারে নাক ঝাড়াঝাড়ি আর কান্নাকাটির কথা স্মরণ করিয়া এ-কালের উন্নতির দরুণ কাত্যায়নী সুখভরে খানিকটা হাসিয়া লইলেন—

জগবন্ধু বলিলেন,—এখন যাওয়া বন্ধ হয় কি করে!···তারপর তিনি বৌমাকেই ডাকিয়া বলিলেন,—এখন যাও, আবার শীগ্‌গিরই নিয়ে আস্‌ব···কেমন?

কিশোরী শ্বশুরের সঙ্গে এখনও কথা কহে নাই—

ঘোম্‌টার ভিতর ঘাড় নাড়িয়া শ্বশুরের কথায় সে রাজি হইয়া গেল···কিন্তু তার বুকে জলের সাগর লাফাইয়া উঠিল—

পিতৃকুলের মাঝে স্বামীকে কল্পনা করিয়া কিশোরীর প্রাণ ধড়্‌ফড়্ করিতে লাগিল···স্বামীর হৃদয়ের বীভৎ-সতা আগে যেন এত পরিস্ফুট হইয়া তার চোখে পড়ে নাই।

কিশোরী পিত্রালয়ে আসিয়াছে—ব্যবস্থামত অকিঞ্চন তার সঙ্গে।...সারাটি পথ কিশোরীর দুশ্চিন্তার অগ্নিকুণ্ডে কাটিয়াছে।···

বাধ্যতামূলক শিক্ষার ফলে স্বামীর প্রতি ভক্তি প্রীতি তার আজই জন্মিয়াছে কিনা তাহা বলা শক্ত ; কিন্তু স্বামী যে পর নয়, নিজেরই লোক, সে বিষয়ে কোনো দ্বিধা তর্ক তার মনে নাই—থাকাই আশ্চর্য্য।

পরের কথা পরে হইবে—

জীবনের এখনও ঢের বাকী—

আপাততঃ যে কাজটি অবশ্যকর্ত্তব্য অথচ নিদারুণ দুঃসাধ্য মনে হইতেছে তাহা এই যে, কি উপায়ে সইকে আড়ালে রাখা যায়।... একটুখানি শোভনতার ব্যতিক্রমে যে কি লজ্জাকর কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি হইতে পারে, কিশোরী যতটুকু মেয়েই হোক, তাহা তাহার অবিদিত নহে ; যাহাতে গোষ্ঠীসুদ্ধ লোককে মাথা হেঁট করিতে না-হয় তাহার একমাত্র উপায়, মনের কথা বিন্দুবিসর্গ জানিতে না দিয়া সইকে দূরে সরাইয়া রাখা—

কিন্তু তা' যেমন দৃষ্টিকটু তেমনি অসম্ভব—

সই একেবারে উদগ্রীব হইয়া আছে।

কিশোরী পুনঃ পুনঃ ঘামিয়া উঠিতে লাগিল।

এইসূত্রে কিশোরীর জ্ঞান অনেক দিকেই বিকশিত হইয়া উঠিল। সে যে সুন্দরী ইহা সত্য, বাহুল্য তোষামোদের বাক্‌চাতুর্য্য ইহা নহে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা নিরবচ্ছিন্ন অব্যাহত থাকিয়া ঋজু পথে চিরকাল চলিবে ইহাই সাধারণ নিয়ম।...রূপ দিয়া বাঁধিতে যাওয়া শ্লীলতার জ্ঞানে বড় কঠোর হইয়া বাজে ; অথচ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইয়া থাকা চলে কেবল তারই যার সে কথা মনে উঠিবার

কারণই ঘটে না।...সম্পর্কটার দায়িত্ব আর পবিত্রতা যে ব্যক্তি পদে পদেই অতিক্রম করিয়া চলিতে উদ্যত তাহাকে নিবৃত্ত করিবার একমাত্র উপায় কি রূপ ?...স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়েও যেখানে রূপজ লালসাই মুখ্য জিনিষ বলিয়া গণ্য করিবার দরকার হয়. সেখানে প্রণয়ের সহিষ্ণুতা কতটুকু ! আর তার সার্থকতা কোথায় ?

মনে করিতেই কিশোরীর সর্ব্বান্তঃকরণ দুস্তর ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল...তার মনে হইল, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক তার এত হাল্কা আর আল্গা যে বাহিরের একটি ফুৎকারেই তাহা ভূমিসাৎ হইয়া যদি যায় তবে বিস্ময়ের কিছু নাই ; অপরাধই বা কি !

কিন্তু কিশোরী জানে না যে অকিঞ্চনের স্তর আরও নিম্নে, সে আরও দুর্ব্বহ।

কিন্তু আপাততঃ কিশোরীকে জীবন দিল অপরা নিজে। এমন সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে তাহা কিশোরী কল্পনা করিতে পারে নাই! বিবাহের বাসরে বরের সঙ্গে এবং সম্মুখে যে প্রগল্ভতা আর যে স্বাধীন আচরণ সম্ভব হইয়াছিল, বিবাহের পর সেই বরই পর-পুরুষে রূপান্তরিত হইয়া অপরার পক্ষে তাহা দুষ্কর হইয়া উঠিল। অকিঞ্চনের সম্মুখে আসিবার ইচ্ছাটাই তার যেন পায়ে পায়ে জড়াইয়া আসিতে লাগিল—

অপরা আসিল না—

কিশোরী বাঁচিয়া গেল।

শ্বশুরবাড়ীতে নূতন জামাই অকিঞ্চনের অভ্যর্থনা হইল উচিত

মতই—অকিঞ্চনের রুচি উপযোগী। ভৃত্য হরিগতি সদাই তটস্থ... জামাইবাবুর কখন কি হুকুম হয়...শাশুড়ী 'বাবা' 'বাবা' করিয়া গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া গেলেন...রাধাবিনোদের, অর্থাৎ শ্বশুরের, আপ্যায়নে অকিঞ্চন যেমন বিস্ফারিত আর পুলকিত হইল, তাঁর অন্তঃপুরে অশ্রান্ত আনাগোনায় তাঁর স্ত্রী হেমশশী তেম্‌নি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

যেন ওঁরই সব গরজ; জামাইকে খাওয়াইতে, বসাইতে, আদরে তৃপ্ত করিতে, হেমশশী যেন জানেন না; যেন অন্দরের খুঁটিনাটি যাবতীয় গৃহস্থালী এযাবৎকাল পুরুষের তত্ত্বাবধানেই সুসম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে!

হেমশশী একবার হাসিয়া ধমক্ দিয়া বলিলেন,—ঢের হয়েছে, তুমি এখন বাইরে যাও; এখানে বসে' আক্কেল খরচ ক'রো না... আমার হুঁস আছে। জামাই তোমারও, আমারও।

—আচ্ছা, আচ্ছা—যাচ্ছি। দেখ' যেন জামাইয়ের অযত্ন না হয়। বলিয়া রাধাবিনোদ ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে একটা খট্‌কা বাধিয়াই রহিল। সব উপকরণ আছে কি না, এবং না থাকিলে সময় থাকিতে ওঁদের যদি মনে না পড়ে—সুতরাং রান্নাঘরের ভিতরে আর একবার উঁকি মারিয়া সেই দুশ্চিন্তাটা লইয়াই তিনি বহির্ব্বাটীতে গিয়া উঠিলেন।

হেমশশী জামাই আসিবার সংবাদে সাতদিন ধরিয়া জলখাবারেরই কত রকম সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার অন্ত নাই—দফা সংখ্যায় তারা তিরিশের কম নয়।

অকিঞ্চন পরিতোষপূর্ব্বক সেগুলি ভোজন করিল।

স্নানের সময় ভৃত্য হরিগতি দলাই মলাই করিয়া তেল মাখাইয়া অকিঞ্চনের গা পালিশ করিয়া ছাড়িয়া দিল...মাথায় জল ঢালিয়া গামছা দিয়া গা মাজিয়া স্নান করাইয়া দিল···গামছার জল নিংড়াইয়া গা মুছিয়া দিল···কাপড় ছাড়াইল···পায়ে চটি পরাইয়া দিল—

জামাইবাবুর ক্লেশ না হয়।

সাধারণ কেহ হইলে চক্ষুলজ্জার খাতিরেও হয়তো একটু আধটু আপত্তি করিত; কিন্তু অসাধারণ অকিঞ্চন জামাতৃ গৌরবে অধিকতর অসাধারণত্বে পৌঁছিয়া মেয়েদের পুতুলটির মত নির্ব্বিকারচিত্তে সেবা গ্রহণ করিল—যেন এই অতিরিক্ততাও শ্বশুরালয়ে আগত যে-কোনো জামায়েরই প্রাপ্য!

সুবিবেচক রাধাবিনোদ এমন প্রশ্ন একটিও করিলেন না যাহার জবাব দিতে জামাতাবাবাজী বিব্রত বোধ করিতে পারে—যথা, লেখাপড়া যারা অল্প বয়সেই ত্যাগ করে নাই তাদের কথা, যারা কাজ করিয়া খায় তাদের কথা...ইত্যাদি। তাঁহার সম্মুখে জামাই লজ্জায় পাছে ক্ষুধা চুরি করে এই ভয়ে তাহার আহারের সময় রাধাবিনোদ অনুপস্থিত রহিয়া গেলেন। ইহাতে বুঝা গেল, জামাই অকিঞ্চনকে তিনি চিনেন নাই।

কিশোরী পরিবেশন করিতে লাগিল ..

কেমন করিয়া খাওয়াইতে হয় হেমশশী তাহা জানেন...জামাইকে তিনি আকণ্ঠ বোঝাই করিয়া ছাড়িয়া দিলেন...

এবং জামাইয়ের আহারের পর কিশোরীর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া মুখের ঘাম মুছিয়া দিয়া উপরে পান পাঠাইয়া দিলেন।

উপরেই অকিঞ্চন বিশ্রাম করিতে গিয়াছিল—

পান হাতে লইয়া অকিঞ্চন বলিল,—খুব খেলাম কিন্তু গণ্ডেপিণ্ডে... সইলে হয়!—তারপরই জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার সইকে দেখ্‌লাম না ত?

কিশোরীর মুখের দীপ্তি দপ্‌ করিয়া নিবিয়া গেল।

সে সাধনা করিয়া প্রফুল্লতা আনিয়াছিল...ঐ একটি প্রশ্নেই ক্ষণিকের বুদ্‌বুদের মত তাহা নিঃশব্দে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গেল—

ম্লানকণ্ঠে বলিল,—তাকে কেন?

অকিঞ্চন বলিল,—কেন আবার কি? যা' ভেবেছ তা' নয়—দেখ্‌তাম একটু। বস' বলিয়া অকিঞ্চন স্ত্রীকে বসিতে আহ্বান করিয়া নিজের ডান দিকটা দেখাইয়া দিল—কিন্তু এ আদর একেবারেই বৃথা হইয়া গেল। কিশোরী একটু বসিতেই আসিয়াছিল—তবে সইয়ের কথা স্বামীর মুখে শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসে নাই... নিজেরই মনের জ্যোৎস্না বিচ্ছুরিত হইয়া তার চারিদিকে হাসিতেছিল; কিন্তু কঠিনতম তমসায় তাহা এমনই দ্রুতগতি বিলুপ্ত হইয়া গেল যে, সহসা এই নিদারুণ পরিবর্ত্তন তাহার সহ্য হইল না—

...জলে চোখ ভরিয়া উঠিল এবং স্বামীর দিকে পিছন ফিরিয়াই ছুটিতে ছুটিতে নামিয়া আসিতেই একেবারে মায়ের সম্মুখেই সে পড়িয়া গেল।

—কাঁদছিস্‌ যে?—জিজ্ঞাসা করিয়া হেমশশী দাঁড়াইয়া পড়িলেন। কাঁদিতে কাঁদিতেই কিশোরী বলিল,—না কাঁদি নি···। তুমি ওঁকে আজই যেতে বলো। বলিয়া সে পাশ কাটাইয়া দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মাথামুণ্ডু কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া হেমশশী অবাক্ হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন…।

কিন্তু কথাটা বড় গুরুতর ; সমস্ত সমাচার অবিলম্বেই জানা চাই-ই। কিশোরী বড় ঠাণ্ডা আর বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে কাঁদিয়াছে, আর জামাইকে তাড়াইবার কথা বলিতেছে! ইহা যেমন আশ্চর্য্য, তেমনি দুঃখজনক। ইহার গূঢ় কারণটা না-জানা পর্য্যন্ত তাঁর স্বস্তি নাই. কোনো মায়েরই তাহা থাকিতে পারে না—মেয়ের অবলম্বন আর জীবনের সিদ্ধিদাতা হিসাবে জামাই যে অদ্বিতীয়।

হেমশশী গিয়া কিশোরীকে ধরিলেন—

"কি হ'য়েছে বল্।"

কিন্তু সে কথা বলিবার নয়—

"কিছুই হয়নি, মা।" বলিয়া কিশোরী মুখ বুঁজিয়া রহিল. মাথা খুঁড়িয়াও হেমশশী মেয়ের মুখ দিয়া আর একটি বর্ণও বাহির করিতে পারিলেন না—মেয়ের কান্নার কারণ ; এবং তাঁহাদের অত্যন্ত আদরের জামাতাকে, মেয়ের পরম গুরু পতিকে, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার কথা মেয়েই কেন বলিল তাহাও তখনই তাঁর জানা হইল না। অত্যন্ত গুরুতর একটা ভয়ে হেমশশীর বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল এবং অবশেষে তিনি পরাভব মানিয়া আধুনিকতার স্কন্ধে সমুদয় দোষ চাপাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া আসিলেন।

অকিঞ্চনের প্রশ্ন, কিশোরীর কান্না এবং হেমশশীর ক্রোধেই ঘটনার

পরিসমাপ্তি ঘটিল না—ভিন্ন দিকেও তার ফলোদ্গম দেখা দিল।

কিশোরীর কথাটা অকিঞ্চনের কানে গিয়াছিল—অকিঞ্চনের শ্রবণ-শক্তি প্রখর বলিয়া নয়, নৈকট্যবশতঃ, আর কিশোরী কথাটা সাবাধনে আস্তে বলে নাই।

"তুমি ওঁকে যেতে বলো"—শুনিয়া অকিঞ্চন কিন্তু চমকিয়া ওঠে নাই, চমকান তার ধাত নয়—যেমন ছিল তেমনি সে খানিক চূর্ণ করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল। কিশোরীকে ইহজন্মের মত পরিত্যাগ করিলে এই অপমানের যথোচিত প্রতিফল দেওয়া হইবে কিনা তাহাই সে গম্ভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিল…।

সিদ্ধান্ত হইল—হইবে।

তখন সে আস্তে আস্তে উঠিয়া জানালায় মুখ দিয়া দেখিল, শ্বশুর আসনে বসিয়া আছেন, হাত ধুইয়াছেন; কিন্তু ভাতের থালা এখনও আসে নাই।

ডাকিল,—একবার ইদিকে শুনুন ত'।

রাধাবিনোদ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, বাবাজীউ—.

দেখিয়াই তিনি যে ভাতের থালার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন তাহা বিস্মৃত হইয়া গেলেন: কারণ, আগে জামাইয়ের আহ্বানের সম্মান রক্ষা, তারপরে দাবি পূরণের চেষ্টা—ইহা না করিলে অন্যায় হইবে।

কাজেই রাধাবিনোদ শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িলেন, চটি ফেলিয়া খালি পায়েই প্রায় দৌড়াইয়া উপরে উঠিয়া গেলেন, এবং জামাইয়ের সমীপস্থ হইয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলছ, বাবা?"

তিনি ভাবিয়াছিলেন, জামাই বুঝি কিছু আব্দার করিবে—বন্ধুর পুত্র হিসাবেও তাহা সে পারে।

প্রশ্ন করিয়া রাধাবিনোদ গদগদ দৃষ্টিতে অকিঞ্চনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু অকিঞ্চনের আব্দার করিবার কিছু ছিল; সে আচম্‌কা জিজ্ঞাসা করিল—ফেরবার গাড়ী কখন?

ওদিকে রান্নাঘরে হেমশশী উৎকর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁহারও কানে প্রশ্নটা গেল—

রাধাবিনোদ ফেরৎ গাড়ীর প্রশ্নে খুব আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন; বলিলেন,—কেন সে কথা কেন?

জামাই যে কেবল আজই আসিয়াছে—অষ্ট প্রহরেরই দুটি প্রহর এখনও অসম্পূর্ণ, অতীত হয় নাই!

অকিঞ্চন যেন ধমক্ দিয়া বলিল,—না! দরকার না থাক্‌লে জিজ্ঞাসা করিনি।

ফিরিবার ইচ্ছা না হইলেও লোকে ফিরিবার গাড়ীর সময় জানিতে চাহে না, ইহা বুঝিবারও রাধাবিনোদ বোধ হয় ধমক্ খাইয়াই বলিয়া দিলেন,—তিনটেয় একটা আছে।

—তবে একখানা গাড়ী ডাক্‌তে লোক পাঠিয়ে দিন।

—আজই যাবে না কি?

—মনের ইচ্ছে তাই।

জামাইয়ের মুখ-চোখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া আর কথার সুর শুনিয়া, শ্বশুর জামাতার কথা শুনিয়া যতদূর বিস্মিত হইতে পারে ততদূর

বিস্মিতই রাধাবিনোদ হইয়াছিলেন—এইবার তিনি চকিত হইয়া উঠিলেন…এতক্ষণে তিনি নিঃসংশয়ে হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে জামাইয়ের যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশে আর যাহাই থাক্ কপটতা নাই।

বলিলেন,—কি মুস্কিল! কি হয়েছে যে এসেই চলে যাবে?

"কারণ আছে। আমি ত' আর বেকারজীবী ভবঘুরে নই! গাড়ী ডাকৃতে ব'লে দিন।" আদেশ দিয়া অকিঞ্চন শুইয়া পড়িয়া শ্বশুরের দিকে পিছন ফিরিল— শ্বশুরের সঙ্গে দরবার তার শেষ হইয়াছে।

রাধাবিনোদ অল্পেই ব্যাকুল হইয়া পড়েন—

বাড়ীর কাহারো জ্বরের উত্তাপ সাড়ে নিরানব্বইয়ে উঠিলে তাঁরই ধাত মেলে না। অসুখ বিসুখ প্রভৃতি যেসব বিপদ ইতিপূর্ব্বে ঘটিয়া গিয়াছে ইহার তুলনায় তা' তামাসা। রাধাবিনোদ মুমূর্ষুর মত অষ্টাঙ্গে অবশ হইয়া উপর হইতে অবতরণ করিলেন।

দরজার সম্মুখেই হেমশশী আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন—

আকুল চক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া রাধাবিনোদ জানিতে চাহিলেন,—ব্যাপার কি? আমি ত' কিছুই বুঝতে পারছিনে। অকিঞ্চন আজই তিনটের গাড়ীতে যেতে চাইছে! হয়েছে কি?

হেমশশী তাঁহার হাত দূরে টানিয়া লইয়া গেলেন; বলিলেন,—বলছি। তুমি খেয়ে নাও আগে—ভাত বেড়েছি।

রাধাবিনোদের ভাতের আর প্রয়োজন ছিল না; তাঁর দৈহিক আকাঙ্ক্ষার নির্ব্বাণলাভ অকিঞ্চনই ঘটাইয়া দিয়াছে; বলিলেন,—না। না শুনে আমি খেতে বস্‌ব না।

সুতরাং হেমশশী যাহা জানিতেন সব বলিলেন: এবং নিজের এক—

সন্দেহটাও অপ্রকাশ রাখিলেন না যে, মেয়ের সেই দুষ্টা অপরাধের কটূক্তিটা বোধ হয় জামাইয়ের কানে গেছে।

রাধাবিনোদ বলিলেন,...বোধ হয় কেন! নিশ্চয় গেছে। এখন উপায়!

হেমশশী বলিলেন,—উপায় আর কি! চলো, দু'জনাই যাই জামাইয়ের কাছে।

দু'জনাই জামাইয়ের কাছে গেলেন—এবং তারপর যে মর্ম্মান্তিক ব্যাপার ঘটিতে লাগিল তাহা বুঝান দুষ্কর। দুর্ভাগ্য, কিন্তু অকিঞ্চনের বিশেষ সম্মানের পাত্র রাধাবিনোদ এবং বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী হেমশশী জামাতার দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া কেবল তার পায়ে ধরিতে পারেন না বলিয়াই পায়ে ধরিলেন না; কিন্তু তাঁহাদের যাবতীয় মিষ্ট বাক্য, কাকুতি, মিনতি, কান্নাকাটি, হাতে ধরা, মাথার দিব্যি একেবারে নিষ্ফল হইয়া গেল—দেবতার শিলামূর্ত্তির পায়ে মানুষ মাথা কুটিয়া কখনও অত নিষ্ফল হয় নাই।

অকিঞ্চন একবার মুখ ফিরাইয়াও তাঁহাদের দিকে চাহিল না।

হতাশ্বাসের চরম বিন্দুতে পৌঁছিয়া অবশেষে রাধাবিনোদ বলিলেন—আর কিছু বল্‌বার নেই, বাবা। আমাদের তুমি ক্ষমা করো।

হেমশশীও স্বামীর প্রার্থনাটা অধিকতর দ্রবকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন...।

কিন্তু অকিঞ্চন দ্রব বস্তু গায়ে মাখিল না; প্রত্যুত্তরে মুখ ফিরাইয়া শ্বশুরের মুখের দিকে নেত্রপাত করিয়া ভ্রূভঙ্গীর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সে জানাইয়া দিল যে, তোমাদের আবেদন মঞ্জুর করা হয় নাই।

মরমে মরিয়া আর দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া উভয়ে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় অকিঞ্চন বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, বলিল,—একটুখানি দাঁড়িয়ে যান্।

বুঝি কৃপা হইয়াছে—

উভয়ে আশান্বিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

অকিঞ্চন শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল,—অপমান হজম ক'রে আপনি আমাকে থাকতে বলেন! ছিঃ! শুনুন্ গিয়ে আপনার মেয়ের কাছে, সে তার মায়ের কাছে কি বলেছে!···আপনিই বলুন না! বলিয়া সে হেমশশীর দিকে আঙুল তুলিল।

এত বিব্রত তুমুল উৎকণ্ঠার মধ্যেও রাধাবিনোদের মনে হইল, এমন ধৃষ্টকর্কশকণ্ঠ তিনি জীবনে শুনেন নাই। তবু তিনি বলিলেন—তাঁর বেদনাভারাতুর কণ্ঠ কি করিয়া শব্দ উচ্চারণ করিল তাহা তিনিই জানেন—কিন্তু বলিলেন,—তার হ'য়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। সে অবোধ, ছেলেমানুষ—প্রথমবার তাকে মাপ করো। বলিতে বলিতে রাধাবিনোদ স্পষ্ট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন না বটে, কিন্তু তাঁর চোখ লাল হইয়া এক ঝলক্ জল আসিল।

ইহার পরেও আপন গোঁ-এ চলিতে বোধ করি ঐ অকিঞ্চনেরও চক্ষু-লজ্জা জন্মিল; বলিল,—আচ্ছা; এখন যান্।

অর্থাৎ ক্ষমা করা গেল; আপনাদের এখন ছুটি।

অকিঞ্চনের রাগ ভাঙ্গিয়াছে—

সে ক্ষমা করিয়াছে এবং যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া শ্বশুরের ভদ্রাসনকে কৃতার্থ করিয়াছে। কিন্তু যে-কথাটা এমন কুফল প্রসব

করিল, সে-কথাটা কিশোরী কেন কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চারণ করিল তাহা কেহ আর অনুসন্ধান করিলেন না—একটি ভীত অপরাধী অন্তর ছাড়া আর সবারই তাহা অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

জামাতা কন্যার দুর্ব্যবহার ক্ষমা করিয়াছে, ইহা আনন্দের কথাই, কিন্তু গৃহে সে অনাবিল আর অনাহত আনন্দ হাসিটি যেন আর ফুটিতে চাহিল না।

অকিঞ্চনের মনের একটি জীবন্ত ছবি রাধাবিনোদ আর হেমশশী উভয়েই দেখিতে পাইয়াছেন—সেখানে সুশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে না—সৌম্যভাব তার নাই—সৌষ্ঠবও সুবিধার নয়, মোটের উপর স্থান বড় কঠিন।

কিন্তু সে আলোচনা একেবারে বন্ধ—

হেমশশী যদি একটু হা করিতে চান্ রাধাবিনোদ অমনি তাড়িয়া ওঠেন—চুপ্, চুপ্।

হেমশশীর বুক সারা দিনমান উদ্বেগে দুরু দুরু করিয়াছে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তাই তিনি জামাইয়ের মেজাজ আরো খানিকটা ঠাণ্ডা করিবার উদ্দেশ্য লইয়া একবার উপরে গেলেন...

সেখানে কি ঘটিল তাহা বিস্তৃত করিয়া বলিবার দরকার নাই; তবে শাশুড়ীর অনেকগুলি স্নিগ্ধ, সরস এবং মর্ম্মস্পর্শী বাক্যের উত্তরে অকিঞ্চন পান চিবাইতে চিবাইতে কেবল বলিল,—সে হবে'খন্।

"সে হবে'খন্"—এর অর্থ হেমশশী ইহাই বুঝিলেন যে, আসুক সে; ঝোঝাপড়া ওর সঙ্গে।

অকিঞ্চন সমস্ত দিন গম্ভীর হইয়া ছিল; বৈকালিক জলযোগের সময়েও বিশেষ বাক্যব্যয় করে নাই, অর্থাৎ বুঝা গেছে যে, ঝড় থামিলেও মেঘ কাটে নাই।

তার উপর ঐ "হবে'খন্" শুনিয়া হেমশশী বিষম ভয় পাইয়া নামিয়া আসিলেন এবং কিশোরীকে পুনরায় যারপরনাই সাবধান করিয়া আর শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দিলেন···ভয়ে ত্রাসে বুক হিম হইয়া সে বেচারী একেবারে সায়েস্তা হইয়া গেল।

কিন্তু গোলমাল বিশেষ কিছুই হইল না···

মায়ের শিক্ষামত কিশোরী অকিঞ্চনের পায়ের উপর কপাল ঠুকিয়া ক্ষমা চাহিল—

তাহাতে দেবতা সন্তুষ্ট হইলেন।

সূর্য্য ওঠে, অস্ত যায়—

কিন্তু বাগ্‌দীপাড়ার সঙ্গে সূর্য্যের উদয়াস্তের কেবল খাওয়ার সময়টা আনিয়া দেওয়ার সম্পর্ক। একবার এগারোটায় ক্ষুধার উদ্রেক আর নিবৃত্তি; দ্বিতীয়বার রাত্রি আটটায়। কাজের দিক্ দিয়া সংস্পর্শ প্রায়ই নাই। অনাবৃষ্টির দিন গুনিয়া যখন হা করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে, দুর্ভাবনায় তার বুকের রক্ত শুকাইতে থাকে, তখনও বাগ্‌দীপাড়া আপন মনেই আর আপন আসনেই ধ্যানস্থ—সে-দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই।

তারপর একদিন গুরু গর্জ্জনে বারিপাত সুরু হয়—

গতিহারা জাহ্নবী

দিকে দিকে হলকর্ষণ, প্রাণান্ত শ্রম চলিতে থাকে···বসুন্ধরার রুক্ষ অঙ্গ "হরিতে হিরণে" নয়নাভিরাম হইয়া ওঠে—কিন্তু বাগ্‌দীপাড়ায় চাঞ্চল্য জাগে না ; বাগ্‌দীপাড়া নিষ্কাম !

সরু একফালি রাস্তা চারিদিকে শাখা ছড়াইয়া বাগ্‌দীপাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে ; তার দু'পাশে বসতি ; শাখাপথগুলি আরও সঙ্কীর্ণ—দুটি লোকের পাশাপাশি দাঁড়ান চলে না। পল্লীটা বিস্তৃত কিন্তু বৈচিত্র্যহীন, যেন তন্দ্রালু।

বুড়িটা বসিয়া থাকে—

তার লজ্জাবোধ আর দৃষ্টিশক্তি আছে কি নাই, নাতিটি কোলে থাকে ; শীর্ণদেহ শিশু, রোগে ভরা—তবু ঠোঁটে এক ফোঁটা হাসি।

উঠানে হাঁস চরে। পথ জুড়িয়া রুগ্ন কুকুরটা পড়িয়া থাকে। পল্লবহীন গাছের তলায় শিশুরা ধূলো উড়ায়···

যেদিকে চাওয়া যায়, লক্ষ্মী-শ্রী কোথাও নজরে পড়ে না ; বাড়ী, ঘর, চাল ছাপ্পর দেয়াল দরজা যেন আর খাড়া থাকিতে পারে না—উপরে গোঁজা তালি, নীচেয় ঠেক্‌ন'।

আর পুরুষেরা বিস্তি খেলে—বিরিঞ্চি, বহু, সুরেন্দ্র, কার্ত্তিক, রূপকৃষ্ট প্রভৃতি। জানিত কোন উপজীবিকা ইহাদের আছে বলিয়া মনে হয় না, অথচ তেলে-জলে বেশ মসৃণ নধর দেহ—চুলে সরু পাতা কাটা, কারু তেরী, কারু সিঁথি।

শুকন' স্ত্রীলোকটি উঠানে তালাই পাতিয়া বসিয়া বিড়ি বাঁধে বিরিঞ্চির সঙ্গে সাদৃশ্য তার কোথাও নাই—বিরিঞ্চি হৃষ্টপুষ্ট দমদমে, কয়লা লম্বা আর সরু—পাঁজরের হাড় গণা যায়। বিরিঞ্চির সঙ্গে

তার চুক্তি এই যে, বিড়ি বাঁধিয়া যত সে উপার্জ্জন করিবে, খরচ বাদে লাভের অংশ দু'জনার সমান সমান—মূলধন বিরিঞ্চির। সেই অর্দ্ধেক লাভে কমলার খাওয়ার খরচ যতটা পোষাইবে ততটাই সে খাইতে পাইবে, তার বেশী নয়। কমলা তাহাতেই রাজি—তার গত্যন্তর নাই। স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে।

বিরিঞ্চিরা যখন বিস্তি খেলে না তখন কারু দাওয়ায় তারা আড্ডা দিতে বসিয়া যায়।

হুঁকা হাতে হাতে ফেরে—

তারা বিবিধ বিষয়ে গল্প-গুজব করে—

বহু বলে,—পা'ট খেটে আর সুখ নাই। ধান-কলাই আমাদের ভালো। বস্তা টেনে দিয়ে তিন ঘণ্টায় খালাস, ঠিকে কাজ, ইচ্ছেমত কাজ, গা চাইলে না, ফেলে রেখে চ'লে এলাম।

গত বৎসরের পূর্ব্ব বৎসর বহু ধান-কলে তিন দিন কাজ করিয়াছিল—তাহারই সুখ-স্মৃতিটা সে শুনাইয়া দিল।

সুরেন্দ্র হঠাৎ বলে,—নায়েব বাবুর রোজগার খুব!

কি সূত্রে নায়েব বাবুর কথাটা তার মনে পড়ে তাহা অপ্রকাশ্য—ধান-কলে বস্তা বহনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নাই, কিন্তু বহু তাহা শুনিয়া খল্‌খল্ করিয়া হাসে, বলে, হাতও খুব দরাজ; দেবায় হাত খুব।...বহু বোধ হয় ঈর্ষাপরায়ণ।

জপকৃষ্টের কতকটা সাত্ত্বিক ভাব—

সে বলে,—যা-ই বল ক্যানে, কাজটা কিন্তু ভাল নয়। করুছেও ত' সবাই। বলিয়া কার্ত্তিক দ্বারবর্ত্তিনী স্ত্রীলোকটির দিকে চাহিয়া হাসে...।

—কি কথা হ'চ্ছে গো ? জানা কথাই জানিতে চাহিয়া রমণী আগাইয়া আসে…মোটাসোটা, মুখে চোখে অত্যন্ত সঙ্কোচহীন হাল্কা ধরণ।

জপকৃষ্ট বলে,—আমাদেরই কথা হচ্ছে…খেটে' খায় সবাই, আমরা ছাড়া সবাই। বাবুরা নিন্দে-বান্দা করে ; সেদিন সভা করেই গালমন্দ দিলে—হাজার লোকের সাম্‌নেই।

—দিক্ কেনে! খেতে' পরতে' না দিয়ে গালমন্দ দিলে কে শুন্‌বে সে কথা ?…আর ভদ্দর লোকেই ত'—

বলিয়া ভামিনী একগাল হাসিয়া চলিয়া গেল।

এম্‌নিধারা আপশোষের কথা দু'চারিটি তাদের হামেসাই হয়, কিন্তু বলা বাহুল্য, তাহা নিশ্চেষ্ট আর নিরর্থক।

বাড়ীর দুয়ারে দুয়ারে স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়াইয়া থাকে…বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া যায়—যেন দৈব কোনো গুরুতর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় সবাই স্তব্ধ।

বিরিঞ্চি প্রভৃতি হরিজনবর্গের অন্তঃপুরিকাগণের অধিকাংশ বেশ-ভূষাই বেশ চমকপ্রদ ; তাদের গায়ে সেমিজ জ্যাকেট ওঠে না, কিন্তু যা ওঠে তাও বেশ চটক্‌দার ; অর্থাৎ বিলিতি শাড়ীর পাড়'-এর রং যেমন পাকা তেমনি উজ্জ্বল, আর সুতোও তেমনি মিহি—আবরণ হিসাবে তা' যেমন শোভন, বাহার হিসাবে তেম্‌নি তা মুনাসিফ ;

প্রসাধন সম্বন্ধেও তাহারা যথেষ্ট যত্নশীলা, কিন্তু রক্ষণশীলা নহে… যেদিন দূরে কোথাও দৈবাৎ দেখা গেল, খোঁপা আর ঝুলিয়া নাই, চাঁদির উপর উঠিয়া আসিয়াছে ; আর কান আর দেখা যাইতেছে না, চুলে ঢাকা পড়িয়াছে—সঙ্গে সঙ্গেই বাগ্‌দীপাড়ায় দেখা যাইবে, তাদেরও খোঁপা চাঁদির উপর বাটখারার স্তূপের মত উঁচু হইয়া আছে—এবং কান একটাও দেখা যাইতেছে না। ঐ খোঁপায় তারা সোনার চিরুণী গুঁজিয়া দেয়…হাতে তাদের এস্‌-বরফি পিতলের চুড়ি…বৈকালে ঘরে ঘরে তেলের বাটি আর আয়না চিরুণী লইয়া চুল বাঁধিবার, আর তারপরে ফর্সা কাপড় পরিবার ধুম্ লাগিয়া যায়…

তবে তাদের হায়া কম—

হায়াটিকে সম্পূর্ণই বিসর্জ্জন দিয়া হারার একটা ছলকে তারা ধরিয়া আছে ; কিন্তু সে আয়োজন একেবারে বৃথা ; চেনা চোরের ব্যোমচারী সন্ন্যাসী সাজিয়া দেখা দিবার মত তা হাসির কথা।

প্রায় ঘরে ঘরে এম্‌নি—

কিন্তু যে দৈববশে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ জন্মিয়াছিল, এবং যে স্বভাব-বৈচিত্র্যে ফণী মনসায় সোনালী ফুল ফোটে তেম্‌নি একটা কারণে এদেরই একজনের ঘরে জন্মিয়াছিল সুন্দরী ভুবনেশ্বরী। বাগ্‌দীপাড়ার ভাষায় নাম ভুবনেশ্বরী রাখা সম্ভব নয় ; কিন্তু বাগ্‌দীপাড়ায় কেবল বাগ্‌দীদের বাস হইলেও আম্‌লা এবং আড়ৎপটির প্রভাব আর সৌকর্য্য নানাদিকে প্রকাশ পাইয়াছে।

গতিহারা জাহ্নবী

ভুবনেশ্বরীর রূপ আছে দেহে, গাম্ভীর্য্য আছে মুখের অবয়বে, আর তেজ আছে মনে···ওদের কেউ তাহাকে বুঝিতে পারে না।

এবং সেই কথাটাই একদিন কয়েকটী মেয়ের সান্ধ্য বৈঠকে উঠিয়া পড়িল।

উঠানের খানিকটায় জ্যোৎস্না পড়িয়াছিল—কারণ জ্যোৎস্নার স্থান-বিচার নাই···পুলকিত সেই জ্যোৎস্নায় গা ছাড়িয়া দিয়া সেই রহস্য-ময়ীর আলোচনা-প্রসঙ্গে চম্পানাম্নী রমণী বলিল,—বুঝতে নারি ক্যানে দেমাক করে ও; ধরাকে সরা দেখে ও কিসের দেমাকে!—বলিয়া চম্পা ধরার বৃহত্বে এবং ভুবনেশ্বরীর ক্ষুদ্রত্বে অত্যন্ত চিন্তান্বিতা হইয়া গেল।

—হাড়ে ঘুণ ধরে' মরবে যেদিন সেদিন বুঝবে দেমাকের মজা। বলিয়া চম্পার পার্শ্বস্থিতা নন্দরাণী চোখ উল্‌টাইয়া হাসিতে লাগিল—যেন বুভুক্ষু মানুষের অস্থিতে ঘুণ ধরা ভারি মজা।

অবশ্য পূর্ব্বে বলি নাই, কিন্তু বুঝিতে হইবে যে, বাগ্‌দীপাড়ার রাতের মূর্ত্তি বড় বীভৎস; পুরুষের জীবনব্যাপী শ্রমবিমুখতার মূলে আছে রাতের অন্ধকারে আচ্ছাদিত একটি ব্যাপার; ভুবন সে দলের নয়।

ভুবন রত্নাকরের স্ত্রী। রত্নাকর শামুকের মত অলস। রত্নাকর যখন কোলের শিশু ছিল তখন তার মা তাহাকে আফিং খাওয়াইয়া বাড়ীতে রাখিয়া খাটিতে বাহির হইত···সেই অভ্যাসটির ঝোঁক বোধ হয় তার রক্তে ছিলই। তারপর জোয়ান বয়সেই একবার বদহজমের অসুখ হইয়া রত্নাকরের জীবন সংশয় অবস্থার পর জীবন রক্ষা পাইলেও তার অস্থি আর চর্ম্ম ছাড়া মাংস শুকাইয়া যায় এবং উকিল-

পাড়ার হোটেলওয়ালা ত্রিবিক্রম ঠাকুরের পরামর্শে আফিং ধরিয়া তবে সে বাঁচে—

রোগকে নির্ম্মূল করিতে তখন এক আনার আফিমে সাতদিন চলিত; মাত্রা এখন বাড়াইতে হইয়াছে। তবু রক্ষাকর গতর নাড়ে,-কিন্তু তাহাতে কুলায় না—তাকে পোষে তার স্ত্রী ভুবন।···এই ভুবনের যত ক্লেশ সবই আর্থিক নহে—নিজের পবিত্রতা রক্ষা করিতে গিয়া সে ধাকা খাইয়া এক কোণে যেন একঘরে' হইয়া পড়িয়া আছে···সে যে দলে ভিড়িতে চাহে না, উল্লিখিত দেমাক্ সেই পবিত্র অনিচ্ছাটার নাম।

অন্নদা বলিল,—সে কথা মরুকগে ; যে যেমন সে তেমন—চিরকালটা ত' দেখে' আস্‌ছি। পড় দিলে কবে লা?

প্রশ্নের উত্তরে দাসী বলিল,—কাল পাঠিয়ে দিয়েছে···রেল পেড়ে।

অন্নদা বলিল,—আহ্লাদী! রেল পেড়ে তা' যেন কেউ দেখ্‌ছে না।

নন্দরাণী বলিল,—নতুন কিনা···

বলিয়া উল্লাসের কারণ ব্যতিরেকেই সে মতির গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল।

মতি বলিল,—চোখ দেখে বাবু মজেছে; বলে' আমার গায়ের ওপর ক্যানে? ওঠ্! বলিয়া নন্দরাণীকে সে বাঁ হাঁটুর একটা গুঁতা দিয়া গায়ের উপর হইতে তুলিয়া দিল।

—তোর এমন সোয়াগী গা তা' কে জানে! ধুলের ঘায়ে মুচ্ছো যাস্!...তবু যদি ঝাঁটা সওয়া গা না হ'ত!

—তুই ঝাঁটা খে গে যা।

—আমি ক্যানে খেতে যাব? তোরই অঙ্গ সেবা করে রোজ রোজ শুনি।

মতি বলিল,—মর, পিরীত খাগী…

এবং তার পরই দেখিতে দেখিতে ব্যাপার তুমুল হইয়া চক্ষের নিমেষে আকাশ ছাড়াইয়া উঠিল…স্তূপ বাঁধিয়া সবাই বসিয়া ছিল—ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সব গলা ছাড়িয়া দিল, এবং আপন আপন বক্তব্য তাহারা অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল এমন অভিনব ভাষায় যা' আর কে থাও ।

কখন কোন্ বাবুর পদার্পণ হয় কে জানে—

পুরুষেরা তাই দূরে দূরে অবস্থান করিতেছিল—

ঝগড়া বাধিতেই তাহারা একপাল আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু হস্তক্ষেপ করিল না…নিজেদের স্ত্রী কন্যা নিকটতম আত্মীয়ার যত নিগূঢ় কথা, শাস্তির কথা, শাসনের কথা, দুর্দ্দশার কথা, নিগ্রহের কথা, পরিমাণ এবং অবসানের কথা, সত্য মিথ্যা বাস্তব অবাস্তবে মিশ্রিত হইয়া কল-স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল…

বাগ্‌দীপাড়ার বিরিঞ্চি, বিহু প্রভৃতি হরিজনবর্গ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এ উহার মুখের দিকে চাহিয়া কেবল হাসিতে লাগিল।

শ্বশুরবাড়ীতে আরো দিন দুই বহাল-তবিয়তে অবস্থান করিয়া ঘরের ছেলে অকিঞ্চন ঘরে ফিরিয়াছে।

মুখের একটি কথায় অত কাণ্ড ঘটায় কিশোরীর মনে হইয়াছিল,

অসাবধান জিহ্বাটাকে সে সাঁড়াশী দিয়া টানিয়া ছেঁড়ে অথবা হাতা পুড়াইয়া তাকে ছেঁকা দেয়…কিন্তু জিহ্বাকে অপরাধী করিলেই মনের আগুন নেবে না।

বাপ মায়ের অবিশ্রান্ত তাড়নায় কিশোরী কেবল একটা কথাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছে : "হঠাৎ বলে' ফেলেছি।"

জিহ্বাকে অপরাধী করিলে যেমন মনের দাহ শীতল হয় না, তেমনি হঠাৎ অর্থাৎ পরিণাম চিন্তা না করিয়া কুকথা বলিয়া ফেলিলে কুকথার অপরাধ লঘু হইয়া যায় না।

কিশোরীর মা বলিয়াছিলেন,—সোয়ামী যা-ই বলুক আর যা-ই করুক তুই তার ওপর কথা বলবার কে?

কথাটা কি তাহা ওঁরা জানেন না, কিন্তু অধিকার সম্বন্ধে ঐ প্রশ্ন করিয়া হেমশশী চোখ দুটিকে এমন পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন যে কিশোরী ভড়কাইয়া গিয়াছিল।

তারপর জামাইয়ের আদর আপ্যায়ন ষোল আনা ছাড়াইয়া আঠার আনায় উঠিয়াছিল।

অকিঞ্চনও তারপর আর সইয়ের কথা তোলে নাই—ভোলেও নাই, মনে মনে তাহাকে খুঁজিয়াছে…এবং আসিবার দিন—"যাক্‌গে অমন সই"—ইত্যাদি বলিয়া অমন নেশা ধরান যার চক্ষু সেই সইকে মনে মনে একেবারে সিন্ধুপারে প্রেরণ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

বিবাহের পর প্রথম বর্ষা নাকি নববধূকে পিত্রালয়ে কাটাইতে হয়; অকিঞ্চনও তাই কিশোরীকে সেইখানেই রাখিয়া আসিল, এবং আশ্চর্য্য নয় যে, যে ছাপটি সে রাখিয়া আসিল তাহা মুছিবার নয়।

গড়িহারা জাহ্নবী

মায়ের আদেশে আর ধমকানিতে সন্ত্রস্ত ও কাতর হইয়া কিশোরী স্বামীর কাছে ক্ষমা চাহিয়াছে; কিন্তু ক্ষমালাভ সে করিল কি না তাহার উন্মুখ অন্তর তাহা অনুসন্ধান করে নাই। কিশোরীর মনের চারিধারে যেন নিবিড় একটি তন্তুজাল গড়িয়া উঠিয়াছে—সেটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে তার ইচ্ছা হয় না। পরস্ত্রীর প্রতি স্বামীর এমন নির্লজ্জ ক্ষুব্ধতা আর লোভের এমন বর্ব্বর প্রকাশ কোনো নারীর সহ্য হইবার কথা নয়; কিন্তু যে সজীব বাক্যগুলি কেবল মানুষের বারম্বার আবৃত্তিতে ফুসফুসের হাওয়া খাইয়া জীবনদৈর্ঘ্যে অনন্ত এবং স্ফীতিতে অনতিক্রম্য হইয়া আছে তাহাকে লঙ্ঘন করিতে পা তুলিলেই ভ্রষ্ট হইতে হইবে, সে অপরাধের মার্জ্জনা ইহকালেও নাই, পরকালেও নাই—ইহাই সনাতন নিয়ম; কারণ তলায় ক্ষুদ্রতম ছিদ্র থাকিলেই জলের কলসী যেমন অকেজো হইয়া যায়, তেমনি তুচ্ছতম স্থানেও নিয়মকে লঙ্ঘন করিলেই লঙ্ঘনের প্রবৃত্তি সহজ হইয়া নিয়মকে ব্যর্থ করিতে পারে। গ্রন্থি একটুখানি শিথিল করিয়া লইতে পারিলে বাঁধন খুলিয়া ফেলিতে কতক্ষণ লাগে।

তবু কিশোরী অকিঞ্চনকে যাহা শুনাইয়াছে, অনুচ্চস্বরে উচ্চারিত হইলেও নিতান্ত নির্বাহ নির্ব্বিষ সে নয়, অকিঞ্চনের বুদ্ধির দুয়ার একটুখানি খোলা থাকিলেই, কাজ হোক্ আর না হোক্, কথার ভাবার্থটা যথাস্থানে পৌঁছিত; কিন্তু সে দিকটা চিররুদ্ধ—স্পষ্ট কথা বলা বা অপরে বলিলে তাহা বুঝিয়া ফেলা অকিঞ্চনের মগজের দুর্দ্দান্ত দৈন্যরাজ্যে সম্ভব নয়।

—আমায় তুমি ছুঁয়ো না।—বলিয়া প্রাণপণে দেহ সঙ্কুচিত

করিয়া কিশোরী সরিয়া গেলে অকিঞ্চন সকৌতুকে জানিতে চাহিয়াছিল—অপরাধ ?

কিশোরীর মনে থাকিলেও মুখে সে বলিতে পারে নাই, "তুমি অপবিত্র। আমার অঙ্গ স্পর্শ করিবার স্পর্দ্ধা তোমার কেন হইবে ?" আনতমুখে সে কেবল বলিয়াছিল "আমি ত' তোমার যোগ্য নই।" বলিতে বলিতে নিদারুণ অভিমানের অশ্রুতে তার কণ্ঠ অচল হইয়া গিয়াছিল।

অকিঞ্চন তাহা মনের কোণেও লক্ষ্য করে নাই। আপাততঃ যাহা হাতের কাছে আছে তাহাকেই আরো কাছে পাওয়াই সে চূড়ান্ত লাভ মনে করিয়াছিল।

অকিঞ্চন চলিয়া আসিবার সময় কিশোরীর প্রাণে বিচ্ছেদ বেদনা বাজে নাই ; কেবল ইহাই ভাবিয়া সে চোখের জল ফেলিয়ছিল যে মায়ের শাসনে এ-যাত্রা ভালয় ভালয় কাটিলেও যখন আবার দোষ দেখা হইবে তখন বোধ হয় সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিবে না।

প্রতিবেশীরা বলে,—ছেলের মাথা তোমরাই খেয়েছ।

জগবন্ধু কথাটা না বোঝেন এমন নয়—স্পষ্ট স্বীকারই করেন, মাথা নীচু করিয়া বলেন,—একটী মাত্র সন্তান !...বলিয়া অত্যন্ত বিমর্ষমুখে অতীতের দিকে চাহিয়া থাকেন।

অকিঞ্চন তাঁহাদের বড় আরাধনার ধন, তাঁহাদের দীর্ঘ দুস্তর দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী তপস্যার ফল ঐ পুত্র অকিঞ্চন—তাঁহাদের তপস্যায় তু

হইয়া দ্বাদশ বৎসর পরে দেব অকিঞ্চননাথ ঐ পুত্র বর দিয়াছিলেন—সন্তানহীন দম্পতীর ম্রিয়মাণ রসহীন দীর্ঘ জীবনের পর ঐ পুত্র—যে উল্লাস পরিপূর্ণতা আর সার্থকতায় দেব অকিঞ্চননাথ তাঁহাদের জীবন সেদিন আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা ত ভুলিবার নয়—

কিন্তু তা' অক্ষয় হইয়া রহিল না—

অকিঞ্চনই তা' কাড়িয়া লইল।

সন্দেহ হয় পিতামাতার অনুচিত প্রশ্রয়েই অকিঞ্চন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ভবিষ্যৎ কে অত ভাবিতে পারে? মনের যে চোখ দুটা সকলেরই থাকে অকিঞ্চনের সে চোখ দুটি তার জন্মক্ষণ হইতেই হীনদৃষ্টি হইলেও কখনও চারুচর্চ্চায় সে দৃষ্টির তেজ বাড়িয়া তার হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞানটা জন্মিতে পারিত কি না তাহা তাহার হৃদয়ের দেবতা জানেন—

কিন্তু সে চোখ তার ফুটিতে পায় নাই।

জগবন্ধু সে দলের লোক নন্। যাঁরা ছেলের উপর অরাজক রাজ্য পাতিয়া এমনভাবে শাসনদণ্ড চালনা করেন যেন ছেলের ব্যক্তিত্ব বা মুক্তির নেশা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না—ছেলে যেন বিশেষ করিয়া তাঁহাকেই বাবা পাইয়া ধন্য হইয়া গেছে।

জগবন্ধু সেই দলের যারা ছেলে পাইয়াই ধন্য।

অত্যন্ত বাড়াবাড়ির দিনেও অন্য কারণে নয়, কেবল অপমানের ভয়েই পুত্র অকিঞ্চনকে তিনি দু'কথা কঠিন করিয়া বলিতে পারিলেন না।

ছেলের উৎপাতে আব্দারে কখনো আমোদ পাইতেন, কখনো

সুখ পাইতেন, কখনো আবার ভ্রূভঙ্গীও করিতেন, তবুও নিঃশব্দে—কিন্তু প্রচণ্ড হইয়া তাড়না কখনো করেন নাই···

এমনি করিতে করিতে হঠাৎ একদিন অকিঞ্চনের হীনতার শেষ যেন আর চোখে পড়িল না ; চোখের দিগন্ত পর্য্যন্ত ঝাপসা ঠেকিয়া তিনি আকুল হইয়া উঠিলেন—কিন্তু তখন তাঁর অবস্থা, যে মাঝির হাতের হাল ভাঙ্গিয়া গেছে তাহারই মত—নিজে তিনি অসহায়। বাহিরের লোককে ঘরে ডাকিয়া জগবন্ধু অকিঞ্চনের সংশোধনের উপায় নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন···তাঁহার শুভার্থিগণ দিগ্বিদিক হাতড়াইয়া নয়, হাতের কাছেই অতিশয় সহজ একটি উপায় পাইয়া গেলেন—

এবং তাহারই ফলে অকিঞ্চনের বিবাহ হইল এমন একটি মেয়ের সঙ্গে যাহার রূপের তুলনা নাই। কিন্তু যে অস্বাভাবিক রুচিবিকৃতি অকিঞ্চনের এক প্রকার সহজাত সে নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তিটির মত সে-দিকে একবার চোখ ফিরাইয়া তাকাইয়া দেখিল কেবল—পথ ছাড়িয়া দিল না।

বলা বাহুল্য, জগবন্ধু বাল্যবন্ধু বৈবাহিকের নিকট এই সব ঘরোয়া কথাগুলি গোপন করিয়াছিলেন। তা' করিবেনই—বিবাহ দিতে বসিয়া বিবাহের পাত্রকেই, আপন পুত্রকেই, কে আর উদ্ঘাটিত করিতে চায়! বাল্যবন্ধুহিসাবে কাজটা বিশ্বাসঘাতকতার কাজ হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ একটা ছিলই, বরাবরই ছিল ; তার উপর বিবাহের পরও পুত্রের মতিগতির পরিবর্ত্তন হইল না দেখিয়াই

তাঁর অন্তরাত্মা যন্ত্রণাবোধ করিতে লাগিল এই আশঙ্কায় যে, কথাটা বৈবাহিকের কানে গেলে বাল্যবন্ধু হিসাবে বিষম চক্ষুলজ্জায়, হয় তো কৈফিয়তের দায়েই পড়িয়া যাইতে হইবে।

জগবন্ধু যখন তখন স্ত্রীর কাছে আসেন—ধন্না দিবার মত করিয়া বসিয়া থাকেন—এবং তাঁর মুখে চোখে ক্রোধ উৎকণ্ঠা আর অনুশোচনা একটা অদ্ভুত মিশ্রিত আকারে ফুটিয়া থাকে…

কিন্তু যতই আলোচনা তাঁরা করুন, নিষ্কৃতির কোনো উপায়ই চোখে পড়ে না—কেবল ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়েন আর চুপ করিয়া ভাবেন…এত ভাবিয়া যে উপায়টি বাহির করা হইয়াছিল তাহাও কাজে লাগিল না—বালির বুকে ফুলের বীজ ফেলিবার মত তাহা অকাজে দাঁড়াইয়া গেল…সুন্দরী কন্যার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন বলিয়াই অকিঞ্চন মনে করিল না।

অকিঞ্চন পূর্ব্ববৎ রাত বারটায় বেড়াইয়া ফেরে—

জগবন্ধু তাহাকে বৈঠকখানায় ডাকেন; বলেন,—কোথায় ছিলি এত রাত অবধি?…প্রশ্ন করিয়া তিনি চোখ দুটাকে যেন টানিয়া টানিয়া তুলিয়া রাখেন—প্রশ্নেরই লজ্জায় যেন তাঁর চোখ নামিয়া পড়ে।

অকিঞ্চন দিব্য সহজ গলায় বলে,—এই বেড়াচ্ছিলাম এদিক-সেদিক। কেন?

গতিহারা জাহ্নবী

এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া উষ্ণ শীতল কঠোর কোমল যত কথা জগবন্ধু বলিবেন বলিয়া মনে মনে সাজাইয়াছিলেন অকিঞ্চন কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই তা' সব ছড়াইয়া যায়—খেই মেলে না...

তবু লজ্জার মাথা খাইয়া চোখ নামাইয়া তিনি বলিয়া যান,—ভাল হ'। তুই ত' ভদ্রসন্তান।—আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা আর অবলম্বন তুই। তোর মুখ চেয়েই আমরা আছি—তা' কি তুই সত্যিই বুঝিস্ নে? বিয়ে দিয়েছি—

বলিতে বলিতে মুহূর্ত্তেকের জন্য তাঁহাকে থামিতে হয়—পুত্রবধূর অনুপম সৌন্দর্য্য আর অন্তরের ব্যথাটা মনে পড়িয়া একটা শ্বাসকাঠিন্য যেন অনুভব করেন...

পুনরায় বলেন,—শ্বশুর শুন্‌লে কি মনে করবেন...বড়ই ঘৃণার কথা হবে। এ সংসার ত' একা তোরই···তুই বুঝে না চল্‌লে আমাদের—

বলিতে বলিতে জগবন্ধু চোখ তুলিয়া দেখেন, অকিঞ্চন কখন চলিয়া গেছে—তিনি এতক্ষণ শূন্যের উদ্দেশে বকিয়া মরিতেছিলেন—

চক্ষু তাঁর জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।

"মা খাবার দাও।" বলিয়া হাঁক ছাড়িয়া অকিঞ্চন গিয়া দাঁড়ায়···

খাবার দিয়া মা কাছে বসেন—

এটা খা, ওটা খা করিতে করিতে ছ' একটা ঢোক্ গিলিয়া একবার বলিয়া ফেলেন,—আমাদের কষ্ট তুই বুঝ্‌বি কবে?

—আমি সব বুঝি। যার যত দুঃখ কষ্ট আছে তার কিছুই আমার বুঝতে বাকি নেই। তোমরা সবাই মিলে আমায় নিয়ে পড়েছ দেখ্‌ছি। বাবাও যেন কি সব বল্‌ছিলেন—শুনিওনি ভাল ক'রে। বলিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া অকিঞ্চন হা হা করিয়া হাসে···

তার হৃদয়হীন হাসির সম্মুখ হইতে মা উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পারেন না—বিষে যেন তাঁর সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসে।

অকিঞ্চন বিছানায় উঠিতে গিয়া দেখিল, কিশোরীর পত্র আসিয়াছে; দেখিয়া অকিঞ্চন আপন মনেই বলিল,—বিদ্যার্ণব ঠাকুর! চিঠি লেখা হয়েছে!

পরিষ্কার হস্তাক্ষর, গোটা গোটা লেখা, উচ্ছ্বাস নাই, অত্যুক্তি, অতিরঞ্জন নাই···কিন্তু অকিঞ্চন তার কোনো সৌন্দর্য্যই লক্ষ্য করিল না—কেবল তার হাসি পাইল শেষের দিকটায়···শেষে লেখা আছে: "আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিও।"

ক্ষমার কথায় অকিঞ্চন হাসিতে লাগিল···অপরাধই খুঁজে পেলাম না—তবে নেহাৎ যদি করে থাক, আর না-ই ছাড়, তবে, ক্ষমা না-হয় করা গেল।

শুনিতে অদ্ভুত কিন্তু সত্য কথা এই যে, কিশোরীর মাই কিশোরীকে দিয়া পত্র লিখাইয়াছিলেন; অনেক স্থানে ভাষাও তাঁরই, ক্ষমা-প্রার্থনাটা তাঁহারই ধমকে কিশোরী বসাইয়া দিয়াছিল। কাজেই উত্তর কি আসে দেখিবার জন্য তিনিই সর্ব্বাগ্রে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন···

উত্তর আসিল, "তোমার পত্র পেলাম। আমার পত্র লেখার সময় খুব কম। কাজেই বেশী কিছু লেখা হয়ে উঠল না।"

পত্র পড়িয়া মায়ের দিকে চাহিয়া কিশোরী খুশীই হইল—যেমন, তেমনি হইয়াছে। থাবা মারিয়া মেয়ের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া হেমশশী এক নিঃশ্বাসে চিঠির আদ্যন্ত পড়িয়া ফেলিলেন...এবং দ্বিতীয় নিঃশ্বাস ফেলিবার পূর্ব্বেই তাঁর মুখের উপর আশাভঙ্গের কালো একটা ছায়া পড়িল...

হৃদয়ে হৃদয়ে সংযোগের স্থলটা তাঁর চোখে পড়ে নাই।

তাঁদের আমলেও স্বামী-স্ত্রীর পত্র বিনিময়ের রেওয়াজ ছিল; তারপর পাড়ার মেয়েদের ফিস্‌ফিস্ কথা আজ পর্য্যন্ত অনেক তাঁর কানে গেছে, চিঠিও দু' একখানা হাতে না পড়িয়াছে এমন নয়—কিন্তু সে-চিঠি এমন নয়—অন্তরের সে পুলক ইহাতে নাই...

কোরকের চতুঃপ্রান্তে আলোকমণ্ডল—তাহারই কম্পিত হিল্লোলের মাঝে কোরকের দলবিস্তার চলিতেছে—তাহার ইঙ্গিত তিনি অন্য চিঠিতে দেখিয়াছেন...মনে মনে তা' দেখাও আনন্দ—একটা সার্থকতা... কিন্তু তার বার্ত্তা এ চিঠিতে নাই...

হেমশশী কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন, সেখানেও নাই। হেমশশী নিঃশ্বাস ফেলিয়া চিঠিখানা মেয়ের হাতে দিলেন।

পাঁজির ধর্ম্ম পালন করিয়া অর্থাৎ প্রথম বর্ষা পিত্রালয়ে কাটাইয়া কিশোরী শ্বশুর-শাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইয়া দাঁড়াইল...

যেন সে নয়নের মণি—যেন সে হারানিধি, আরাধনার ধন, ফিরিয়া আসিয়াছে, এম্‌নি সবেগে দুই বাহু বাড়াইয়া জগবন্ধু ও কাত্যায়ণী পুত্রবধূকে যেন মাথায় তুলিয়া লইলেন। পুত্রের হস্তে আহত হইয়া তাঁহাদের বাৎসল্য বধূকে আশ্রয় করিয়া জুড়াইতে চাহিতেছে—

কি, পুত্রকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার শক্তি যদি কাহারো থাকে তবে কেবল এই মেয়েটীরই আছে—কি, এমন মেয়ে এমন ছেলের হাতে আনিয়া দিয়াছেন তাহারই অনুশোচনায়—কিম্বা অন্য কি কারণে তাঁহাদের অন্তরের মিলনানন্দ আজ এমন করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া কূলপ্লাবী হইয়া দেখা দিল, তাহা তাঁহারাই জানেন—

কিন্তু অকিঞ্চন সেদিনও বেড়াইয়া ফিরিল রাত সেই বারটায়।

কিশোরী ঘুমে ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িতেছিল—কাত্যায়ণী নিজের ঘুম ভুলিয়া তাহাকে কথায় কথায় অন্যমনস্ক রাখিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া সজাগ রাখিতেছিলেন—

ছেলে আসিতেই তিনি উঠিয়া গেলেন,—চোখে জল দাও, বৌমা।

অতঃপর স্বামী-স্ত্রীতে নির্জ্জনে মিলন হইল—"তোমার সেই ডুমুরের ফুল সইয়ের খবর কি?"—মিলনের পর প্রণয়-যাত্রার প্রারম্ভেই এই সুবোধ প্রশ্নে স্ত্রীকে উদ্বোধিত করিয়া অকিঞ্চন খাটে বসিল...

কিশোরী সহজ কণ্ঠে বলিল,—ভাল আছে।

কিশোরী ধমকে চমকে শিক্ষা পাইয়া মনে মনে শপথ করিয়াছিল, তাহার মাও তাহাকে পুনঃ পুনঃ মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, স্বামীর সব কথারই সে যথাযথ উত্তর দিবে, কোন কথারই জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকিবে না, কোন কথাতেই উষ্মা প্রকাশ করিবে না।

কিশোরী নিজের বিবেচনায় ঐ সব হিত বাক্যগুলির একটা সামঞ্জস্য করিয়া লইয়া তাহাদের ব্যবহারিক একটা রূপ দিয়াছিল। সইয়ের কুশল-সংবাদ দিতে তার বাধিল না।

অকিঞ্চন বলিল,—বাপের বাড়ী হ'লে বোধ হয় চলে' যেতে বল্‌তে! বলিয়া সিগারেট টানিতে লাগিল।

খোঁটা খাইয়া কিশোরীর প্রদাহ জন্মিল—

নিঃশব্দে খানিক সামলাইয়া লইয়া সে বলিল,—সইয়ের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রো না।

অকিঞ্চন বলিল,—কেন? জাত যাবে?...তবে থাক, যার সই তারই থাক্।

স্ত্রীর সইকে আপন এক্তিয়ারে আনিয়াই যেন সদ্য সদ্যই প্রত্যর্পণ করিতে হইল স্ত্রীরই হাতে, মুখ এমনি কটু করিয়া অকিঞ্চন খানিক্ চুপ করিয়া থাকিল—

তারপর তার মনে পড়িল যে চিঠি লিখিয়াছিল; জিজ্ঞাসা করিল—আমার চিঠি পেয়েছিলে?

—হঁ্যা

অকিঞ্চন জানিতে চাহিল,—আমার জন্যে তোমার ভাবনা হ'ত?

এ প্রশ্নের উত্তর কিশোরীর ছিল—ভাবনা হইত না। ভাবনা তার হইত না—ইহা স্পষ্টতম সত্য। এই সবে উষা—হৃদ্‌কমল স্ফুটনোন্মুখ; জীবনের যত হর্ষ, আলো, মধু, সবই এখন অনাগতের গর্ভে লুকাইত। কিন্তু যে একটি পরম শুভ মুহূর্ত্তে আত্ম-সমর্পণের পূর্ণতায়, সমগ্রতায় আর রসপ্রবাহে প্রাণ তার নিজস্ব লোকে বিকশিত হইয়া উঠে, সেই মুহূর্ত্তটি ধরা দিতে আসিয়াই পলায়ন করিয়াছে...যাহার উপর চির-সুন্দর আর চির-তন্ময় সুখের সৌধ গঠিত হইয়া উঠে, সেই মুহূর্ত্তটি সেই জিনিষ, কিন্তু সেই অমূল্য অমর মুহূর্ত্তটির শঙ্কা সচকিত

পলায়নের নিরাশ্বাস বেদনার পিণ্ডটা কিশোরীর বুকের চারিপ্রান্ত জুড়িয়া বসিয়া আছে…

কিশোরী সেই অপার বেদনায় স্বামীর জন্য ভাবিতেও ভুলিয়া গেছে।

উত্তর না পাইয়া অকিঞ্চন বলিল,—যতই কর আকুলি, খোদার হাতে সকুলি। আমার অদৃষ্টই খারাপ।…পুরুষের ভালবাসা, মুসলমানের মুর্গী পোষা। তোমাদের ভালবাসা কিসের মত?

—তা আমি জানিনে। বলিয়া মনের উত্তাপ অসহ্য হইয়া কিশোরী একবার নড়িয়া উঠিয়া স্থির হইয়া রহিল…

অকিঞ্চন বলিল—ঘুমুই বাবা। সকালে উঠে আবার…

বাগ্‌দীপাড়ার কথা আগে বলিয়াছি—

সেই বাগ্‌দীপাড়ায় অকিঞ্চনের গমনাগমন আছে—খুব ঘনিষ্ঠভাবেই আছে, এমন কি অনিবার্য্যভাবেই আছে। বিরিঞ্চি, বহু, সুরেন্দ্র, প্রভৃতি হরিজন তার খুব পরিচিত বিশেষ বন্ধু। বিরিঞ্চিদের বিন্তি খেলায় সে-ও একজন; অন্ন-সমস্যায় পরামর্শদাতা; তর্কে সালিশ; হাসি-মস্করায় সঙ্গী; তবে একটা স্থানে তাহাদের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হইয়া আছে—ওদের হুঁকো সে টানে না—হুঁকোর উপর হইতে তুলিয়া লইয়া পত্রঠোসে কল্‌কে টানে। ললনাগণও তার সবিশেষ পরিচিত—অধিকাংশেরই নাম, বয়স প্রভৃতি অকিঞ্চনের জানা আছে।

লণ্ঠনের আলোয় বসিয়া বিস্তি-খেলা চলে—

বিক্রম বলে—বাবু খেলেন ভাল। চোস্ত হিসেব।

উদয় বলে—ল্যাখা-পড়া জানেন যে! আমাদের মত মুরুক্ষু ত' নয়!

অকিঞ্চন খামখাই গরম হইয়া বলে—আরে লে লে থাম্; আর আমড়াগেছে কর্‌তে হবে না—জানা আছে।

কি জানার সে বড়াই করে তা' সেই জানে; কিন্তু জানা তার কিছুই নাই; সে যে ইহাদের কাছেই কত হেয় তাহা তার জানা নাই; কি মন লইয়া তাহাকে তারা ভাল ভাল করে তাহাও তাহার জানা নাই।

—না, বাবু, আমড়াগেছে ক'রব ক্যানে! ল্যাখাপড়া জানা লোকের ধরুন বুদ্ধিই আলাদা—খেল্যাতেই বলুন আর নোচ্চামিতেই বলুন। বলিয়া উদয় হাসিয়া বিক্রমের গায়ে চিম্‌টি কাটে।

খেলিতে খেলিতে ভূষণ বলে,—চা'লের দর জানেন বাবু?

অকিঞ্চন কান দেয় না—

বিরিঞ্চি চোখ্ মট্‌কাইয়া বলে,—চা'ল ত' আব্‌গারী জিনিষ নয় যে বাবু নিজে তার খোঁজ রাখ্‌বেন!

সম্ভ্রম-জ্ঞানটা মানুষের নিজস্ব সম্পদ—শিকারী পশু কি ভারবাহী জানোয়ারের তা নাই আর নাই অকিঞ্চনের।...আনন্দের ক্ষেত্রটা বড় সীমাবদ্ধ, এই ক্লেশটাই মাঝে মাঝে দুঃসহ হইয়া অকিঞ্চনের আমোদ-আহ্লাদ বড়ই বিস্বাদ লাগে...এই পাড়াটা ছিল তাই রক্ষা, নতুবা মরুভূমিতে পড়িয়া বালি চাটিয়া মরিতে হইত। তবু ইহারা যেন যথেষ্ট নয়—তাই ইহাদের উপর মাঝে মাঝে তার রাগ হয়।

অকিঞ্চন বলে—বাবা, ভাল লাগা নিয়ে কথা।

কথাটা ছোট, শেষও হয় ঐখানেই; কিন্তু কথাটা দু'দিক দিয়াই ঠিক—ভাল লাগা লইয়াই কথা। অকিঞ্চনের রুচিতে ইহারা ভালই; আবার মেয়েদেরও অকিঞ্চনকে বেশ ভাল লাগে—তার কণ্ঠ যেন মনের ক্ষেত্র মর্দ্দিত করিয়া বিচরণ করে—এমনি তা' উচ্চ, প্রগল্‌ভ আর প্রাঞ্জল··· অন্তর যেন বাহু মেলিয়া ধরিতে আসে···

ওরা মনে মনে ভাবে, ক্ষ্যাপা! ভাবিয়া যেন ভালই লাগে, তাই কলকণ্ঠে হাসে···কেহ ঘেষিয়া আসে, কেহ মন লুটাইয়া দিয়া আগাইয়া আসে···কেহ কেবল তাকাইয়া থাকে।

অকিঞ্চনের বাজে খরচ মাসে ত্রিশ-বত্রিশ।

এম্‌নি করিয়া অভ্যস্ত অবাধ পথে অকিঞ্চনের দিন অকাতরে চলিতে পারিত; কিন্তু মুস্কিল হইল বিবাহ করিয়া। বিবাহ সম্বন্ধে অর্থাৎ স্ত্রীর সম্বন্ধে অকিঞ্চনের মনোবিকার নাই, বিন্দুমাত্রও নাই—তবু একটু তারা যেন না থাকিয়াও আছে···ফিরিতে রাত বারটা হইলেও অকিঞ্চনের মনে হয় বাধ্য হইয়াই সকাল সকাল তাহাকে ফিরিতে হইতেছে।···চাপা গলায় মা যাহা বলেন তাহার উত্তর তাঁর দেখাদেখি অর্থাৎ বধূকে গোপন করিয়া, চাপা গলাতেই দিতে না হইলেও, কোথাকার একটা নিষেধের অনুভূতি যেন একটা স্থানে রহিয়াছে।—কিশোরী যখন তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে তখন অতি অল্প একটু খানি সময়ের জন্য হঠাৎ যেন একটু থতমত খাইয়া যাইতে হয়,' কিন্তু নিষ্কৃতির কথা এই যে, সেজন্য কাহারো উপর তার বিরাগ নাই।

রাত বারটায় কিশোরীর মুখের দিকে চাহিয়া অকিঞ্চন ফিক্ করিয়া একটু হাসে—

হাসিটার অর্থ কিশোরী বুঝিতে পারে না; কিন্তু অকিঞ্চনের হাসিটা অকারণে দেখা দেয় নাই। বাবা ও মা যে এইটুকু মেয়েকে যথেষ্ট ভয় আর খোসামোদ করিয়া চলেন, অকিঞ্চনের কাছে তাহা গোপন নাই। বন্ধুরা তাহাকে অন্ধ বলে…শূকর মুক্তা প্রভৃতি আরও কত কি বলে, যার অর্থই তার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না…

কিশোরীর মুখের দিকে চাহিয়া তাই এই অবজ্ঞার হাসি—ইহাকে ভয় করিয়া চলিতে হইবে! ইহারই আঁচলে দিনরাত বাঁধা থাকিতে হইবে!

কিশোরী হঠাৎ এক সময় বলে,—তুমি বিয়ে করেছিলে কেন?

অর্থাৎ, যদি নিষ্ঠা জন্মিবে না জানিতে তবে এ বিড়ম্বনা সহ্য করিতে গিয়েছিলে কেন?

অকিঞ্চন বলে—বোধ হয় ঠিকই বলে,—বাবাকে জিজ্ঞেসা করো। তিনি আমার বিয়ে দিয়েছিলেন।…পুনরায় বলে,—বিয়ে করেছিলাম কেন? হাসালে বাপু!

অকিঞ্চনের আরো একটা মুস্কিল বাধিল, এবং সেইটাই চরম সাংঘাতিক।

বাগ্‌দীপাড়ার ভুবনের কথা সে শুনিয়াছিল, অর্থাৎ ভুবন আছে বলিয়া জানিত, কিন্তু তাহাকে স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ তার ইতি-

পূর্ব্বে ঘটে নাই ; দেখিবার লালসাও তার জন্মে নাই ; কারণ চোখের আড়ালে যে রহিয়াছে তাহাকে কল্পনা করিয়া লইতে হয়—সম্মুখে যাহা রহিয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া অনুপস্থিত সত্তাকে মূর্ত্তি দান করা অকিঞ্চনের সাধ্য নয়।

কিন্তু নেহাৎ দৈবাৎ ভুবন অকিঞ্চনের চোখে পড়িল, এবং ভুবনকে তার মনেও ধরিল···এবং একেবারে সোজা মনে ধরার কথাটা প্রকাশ করিয়া দিতেই বাগদীপাড়ায় ঢাকে ঢোলে সাড়া পড়িয়া গেল···

সাড়া পড়িবার ব্যাপার কিছু নয়, কারণ, মূলতঃ কথাটা নূতন নয়—সাড়া পড়িবার কারণ ছিল অন্যত্র।

বিরিঞ্চি, বহু প্রভৃতি পুরুষ এবং চম্পা, পাঁচি প্রভৃতি নারী যেখানে যে ছিল, কেহই শিহরিয়া উঠিল না, বরং যেন হোঁচট খাইয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিল—এম্‌নি স্ফূর্ত্তি··· দেমাকী ভুবনের দেমাক্ ভাঙ্গিতে হইবে ; তাহাকে দলে ভর্ত্তি করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু ভুবন সে মেয়ে নয়—

আর সে নিঃসহায়ও নয়, তার স্বামী বিদ্যমান। কিন্তু স্বামীই যখন বার্ত্তাবহের বার্ত্তা শুনিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল, তখন বারকতক ঠোঁট কাঁপিয়া ভুবনের চোখের জলের উপর বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল—

তবে সে বেশীক্ষণ নয়।

টিট্‌কিরি দিয়া বিন্দু বলে,—

কুড়িয়ে পেলাম পথে যেতে,
হারিয়ে এলাম আঁধার রেতে।

সুর করিয়া ঐ শ্লোক গাহিয়া বিন্দু আবার বলে তোর নিজের খবর জানিস ? তোর···

তারপর বিন্দু ভুবনের মায়ের ইতিহাসটা নিজের ভাষায় দশজনকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিয়া যায়—

ঝাঁট দিবার ঝাঁটা, ঘুটে দিবার গোবর, ঘর নিকাইবার ন্যাতা হাতে করিয়া মেয়েরা থ' হইয়া থাকে আর শোনে···

পুরুষের সম্বল আর সম্মান হুঁকা—তারা তা-ই টানে আর শুনে···

পাঠ্য ভাষায় ভুবনের মায়ের সেই বৃত্তান্ত এইরূপ:—

কোথা' হইতে এক দারোগা আসিল—তার সবই প্রকাণ্ড, উদর, চক্ষু, হাত, পা সবই; অর্থাৎ তিনি বৃহদাকার। চক্ষু দুটি তাঁর সর্ব্বদাই লাল হইয়া থাকিত—এবং সেই চক্ষুতে তিনি চশ্‌মা পরিতেন। জাতিতেও মহৎ ব্রাহ্মণ। ভুবনের মা ললিতা কাজ করিত তাঁহারই উঠোনে, ঘরে ঢুকিতে পাইত না। ভুবনের বাবা লালচাঁদ তখন এম্‌নি কাঠির আকার ধারণ করিয়া হাঁপানীর টানে অবিরাম ধুঁকিতেছে।

কিছুদিন যাইতেই লালচাঁদের চোখের সাম্‌নে একটা রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল—

যাহাকে কাছে পায় তাহাকেই বলে,—ওরে, দেখ্‌ছিস ?

সে বলে,—কি বল্‌ছ ?

—বউয়ের। বলিয়াই লালচাঁদ হাঁপানীর টানে বুকে বালিশ চাপিয়া ধরে।

লালচাঁদ কি বলিতে চায় তাহা কেহই বুঝিতে পারে না; কিন্তু

একদিন সবাই বুঝিতে পারিল। বছর দেড়েক রোগে শয্যাশায়ী থাকিয়া লালচাঁদ ম্যরা যাইবার তিন মাস পরে ভুবন ভূমিষ্ঠ হইল।

এই গল্পটা বলিয়া বিন্দু খিল্ খিল্ করিয়া হাসে…গল্পের সরসতা আস্বাদন করিয়া কত জন যে তৃপ্ত হয় আর কত জন যে ছি ছি করে তার ঠিক নাই…

কে একজন বলে,—ভূতের আবার জন্মবার! এই কথায় পুনরায় হাসির শব্দ তুমুল হইয়া ওঠে।

ইহা সত্যই যে, ভুবনের পঙ্কজশ্রী পঙ্কেই জন্মিয়াছে, কিন্তু পাড়ার লোকের তাহা লইয়া আলোচনা করিবার, বিদ্রূপ করিয়া বিদ্ধ করিবার হেতু কোনদিনই জন্মে নাই—আজ তার বিদ্রোহ আর স্পর্দ্ধা দেখিয়া জন্মিয়াছে। ভুবন এই আবহাওরই মানুষ হইয়া কেমন করিয়া ইহাদের প্রভাব অতিক্রম করিয়া গেছে, ভুবনের মুখের দিকে চাহিয়া তাহা কেহ ভাবে না; তাহাতে বিস্ময় কাহারও নাই, পর্ব্ব নাই—

নরনারীর আক্রোশই সুকঠিন হইয়া তাহাকে মুহুর্মুহুঃ বিদ্ধ করিতে লাগিল…

ভয়ের ঝাপ্‌টায় ভুবনের চোখের আগুন নিবিয়া গেল।

বিরিঞ্চি বিজ্ঞ; সে রকম-সকম দেখিয়া, অর্থাৎ অপরিচিত এই কলরবে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, গোপনে অকিঞ্চনকে বলিল,—ভুবনকে ছেড়ে দেন্, মশাই।

—কেন?

বিরিঞ্চি সহসা প্রশ্নের জবাব খুঁজিয়া পাইল না। নগদ মূল্য

হাতে করিয়া আনিয়া তাহাদের রমণীকে যাচ্ঞা করিয়া দাঁড়াইলে প্রার্থীকে কেন ফিরাইয়া দিতে হইবে তাহার যেন সাক্ষাৎ সত্য কোন কারণ থাকিতে পারে না। অনিচ্ছুককে পীড়ন করিয়া আনন্দ পাওয়া যাইবে না, মাত্র ইহাই ছিল বিরিঞ্চির বক্তব্য—

বলিল,—থাক্, তার ইচ্ছে নেই! যদি হাঙ্গামা করে তখন আপনাকে পালাতে হবে।

অকিঞ্চন জানিতে চাহিল,—তার সোয়ামী কি বলে।

বিরিঞ্চি হাসিয়া বলিল,—সে কিছু বলে না।

ভুবনের স্বামী আফিমের ঘোরে একেবারে নির্ব্বাক্। ভুবন স্বামীকে ভালবাসে কিনা তাহা বলা যায় না; স্বামীকে সে পরম গুরু এবং অচলা স্বামী ভক্তিকেই সে পরকালের একমাত্র পাথেয় জ্ঞান করে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু ইহা সত্যই যে, একটা সহজ বোধে তার এই জ্ঞানটা উজ্জ্বল হইয়া আছে যে, পরপুরুষের কাছে যাইতে নাই; এবং এই কারণেই স্বামীকে একেবারেই অগ্রাহ্য বাতিল করিয়া দিয়া তাহার সঙ্গে ইহা লইয়া কলহ করিবার প্রবৃত্তিও ভুবনের নাই।

অকিঞ্চন বলিল,—তোরা কি বলিস্?

বিরিঞ্চি বলিল,...থাক, বাবু।

—তবে থাক্। বলিয়া অকিঞ্চন বোধ হয় তখনকার মত নিরস্ত হইল।

কিন্তু ব্যাপার ঘটিল অন্য দিক্ দিয়া—অকিঞ্চনও যাহা কখনও ভাবে নাই তাহাই ঘটাইয়া দিল তাহারাই বান্ধবীরা। মেয়েগুলির

কেমন একটা জিদ্ পড়িয়া গেল। অকিঞ্চন পিছাইয়া আসিলে কি হয়!—আগাইয়া গেল মেয়েরা; তাহাদের মনে হইল, ভুবন যেন তাহাদের উপর জয়ী হইয়া যাইতেছে···যাইতে দেওয়া হইবে না।

এইটুকু বড় চমৎকার—

সুন্দরের উপর কুৎসিতের এই আক্রোশের জন্মভূমি পরাজয়-বোধটিকে মানুষ যে অন্ধতায় ভুলিয়া থাকে সেই অন্ধকার কাটিতে বড় বেশী সময় লাগে না—ঝম্ করিয়াই কাটে, আর জ্বলন্ত একটা দাহ রাখিয়া যায়।

অকিঞ্চনের মা রাত্রে রান্না চাপাইয়াছেন—কিশোরীকে তিনি কাছে ডাকিয়া লইয়াছেন; সে তাঁর হাতের কাছে বসিয়া মাল-মসলা জোগাইয়া দিতেছে—

—আর একটু নুন দিই? ধনে-বাঁটা এই টুকুতেই হবে? ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া কাত্যায়ণী কিশোরীকে প্রকারান্তরে শিক্ষা দিতেছেন···

এমন সময় উঠান হইতে ডাকিল,—মা?

অপরিচিত নারীকণ্ঠের ডাক্ শুনিয়া কাত্যায়াণী বাহির হইয়া আসিলেন। চাঁদের আব্ছায়া আলোয় মূর্ত্তিটি দাঁড়াইয়াছিল—কাত্যায়ণী তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—কে তুমি?

মেয়েটি বলিল,—আমায় তোমরা চেননা, মা; আমি বাগ্দী-পাড়ার/। বলিয়া মেয়েটি চোখ মুছিতে লাগিল।

কিশোরী আসিয়া শাশুড়ীর পাশে দাঁড়াইয়াছিল—

মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতেই জিজ্ঞাসা করিল,—এ বউটি কে ?

কাত্যায়ণী বলিলেন,—আমার বেটার বউ।

তারপর তিনজনেই নিঃশব্দ ; অকারণে সময় নষ্ট হইতেছে বলিয়া কাত্যায়ণী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—তাঁর আঁচ বহিয়া যাইতেছে—

বলিলেন—খামকা এসে কাঁদতে বস্‌লে—কি হয়েছে তোমার ? এখানে কেন ?

মেয়েটি বলিল,—আমি আর বাঁচিনে মা ; আমায় বাঁচাও।

অকস্মাৎ বিভ্রম বিস্ময় দূর হইয়া কাত্যায়ণীর বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিল—যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল—তাহারই খর আলোকে তিনি সব দেখিলেন ; কি কারণে মেয়েটি এমন অসময়ে, এবং এত বাড়ী থাকিতে কেন তাঁহারই বাড়ীতে, কাঁদিয়া আসিয়া পড়িয়াছে তাহা জানিতে তাঁর বিন্দুমাত্র ভুল হইল না।...

বুঝিতে পারিয়াই তিনি কিশোরীকে একবার চোখের কোণে লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ অতিশয় ক্রোধের ভাণ করিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন,—এ বালাই আমার দুয়ারে মরতে এল কেন ! চলে' যা, চলে' যা। বলিয়া তিনি এমন দ্রুতগতি হাত নাড়িতে লাগিলেন যেন হাতের হাওয়া দিয়াই মেয়েটিকে উড়াইয়া দিতে চান্।

কিন্তু তা' সম্ভব নয়।

এখানে আসাও ভুল হইয়াছে মনে করিয়া মেয়েটি বলিল, "যাই"। বলিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল ; এবং সে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই যে কাণ্ডটা চক্ষের নিমেষে ঘটিয়া গেল কাত্যায়ণী তাহার জন্য ঘুণাক্ষরেও প্রস্তুত ছিলেন না—মেয়েটিও না—

কিশোরী ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল বলিল,—তুমি যা বলতে এসেছিলে আমায় বলে যাও।

মেয়েটি অবাক্ হইয়া কিশোরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল— যে ব্যথার তাড়নে তার প্রাণ পাগল হইয়া যাইতেছে, সেই ব্যথারই নিবিড় প্রতিবিম্ব যেন কিশোরীর চোখেও ছাইয়া আসিয়াছে।

—বল। বলিয়া কিশোরী তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল···

—না। বলিয়াই সেই মেয়েটি উঠানের মাটিতে বসিয়া পড়িয়া এমন করিয়া কাঁদিতে লাগিল যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়াই সে তাহার পরমায়ু নিঃশোধিত করিয়া দিতে চায়।

কাত্যায়ণী কিশোরীর হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন; বলিলেন, বউমা, এস। বলিয়া তিনি অলস্তভাবে ভ্রূভঙ্গী করিয়া রহিলেন যেন অস্পষ্ট আলোকেও কিশোরীর তা' চোখে পড়ে এবং সে ভয় পায়—

কিন্তু ভয় সে পাইল না; মৃদুভাবেই বলিল,—যাই, মা; কথাটা শুনে যাই। আপনার ঢাকতে যাওয়া বৃথা—আমি বুঝেছি সব; তবু পরের মুখে শুনি নি, কতটা আমায় সইতে হবে।

রাগ না করিয়া, না চেঁচাইয়া, কত দৃঢ় অবিচল হওয়া যায়, আর পরকে বিচলিত করা যায়, কিশোরীর শান্ত কণ্ঠস্বরে তাহারই মুখোমুখী সাক্ষাৎ পাইয়া কিশোরীর হাত ছাড়িয়া দিয়া কাত্যায়ণী থমকিয়া রহিলেন; আর তার ইচ্ছা করিতে লাগিল, বাগ্দীপাড়ার যে মেয়েটি মা বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, টুঁটি ছিঁড়িয়া দিয়া তার কথা বলার ক্ষমতাই নষ্ট করিয়া দেন।

তারপর উঠানের মাটিতে বসিয়া ভুবন কিশোরীর কাছে সব কথাই বলিল—নিজের জন্ম কলঙ্কটা পর্য্যন্ত সে গোপন করিল না—

ঐ কলঙ্কটাই অত্যাচারের সুযোগ দিয়াছে…এবং অন্যান্য সব কথাই সে বলিল—

তাহাদের পাড়ায় গিয়া অকিঞ্চনের আচরণ, অকিঞ্চনের কতগুলি প্রেয়সী সেখানে আছে, তার প্রতি অকিঞ্চনের লোভ, স্বামীর অগাধ নির্লিপ্ততা, তার প্রত্যাখান; তারপর পাড়ারই মেয়েদের ষড়যন্ত্রে তাহাকে কৌশলে ঘরে আটক করা, অকিঞ্চনের আগমন, অকিঞ্চনকে মারিয়া ধরিয়া তাহার পলায়ন—

এবং তারপর অভিযোগ লইয়া এখানে আসা…

ভুবনের একান্ত সন্নিকটে আর একেবারে সম্মুখে বসিয়া আর নির্নিমেষচক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কিশোরী সব শুনিল—

কাত্যায়নী অদূরে দাঁড়াইয়া বোধ হয় কতক শুনিলেন, কতক শুনিলেন না…

কিশোরী তারপরও বসিয়াই রহিল…

কাত্যায়নী নিঃশব্দে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, কড়াই পুড়িয়া ধোঁ ধোঁ করিতেছে।

ভুবন বলিল,—এখন আসি।…তুমি ক্যানে শুনলে? বলিয়া কিশোরীর রক্তহীন বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সে কিছুক্ষণ আবিষ্টের মত অবশ হইয়া রহিল…

কিশোরী বলিল,—শুনলাম ভালই হ'ল। আচ্ছা এস এখন—

ভুবন চলিয়া গেল—

এবং কাত্যায়ণী রান্নাঘরের ভিতর হইতে গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ করিলেন,—বৌমা চান করো। বাগ্দীমাগীকে ছুঁয়েচ।

কিশোরী বলিল,—করি।

তারপর তার মনে হইল বলে,—জননী, কতবার কত জলে স্নান করিলে তোমার পুত্র শুচি হইতে পারে? কিন্তু বলিল না; বলিল না ঘৃণা করিয়া, বাক্যব্যয়ের অরুচিতে।

ইহার পর বাড়ীর আবহাওয়া থম্ থম্ করিতে লাগিল। বলির পর জীবটির মুণ্ড আর দেহ যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এই পরিবারের ভিতর হইতে তেম্নি বিচ্ছিন্ন হইয়া কিশোরী গিয়া শয্যার আশ্রয় লইল··· কাত্যায়ণীর ক্রোধ অগ্নির মত নিঃশব্দে দপ্ দপ্ করিতে লাগিল···জগবন্ধু পশ্চাৎ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া টাকে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ভুবন নালিশ করিতে তাদের বাড়ী গিয়াছে শুনিয়া সে রাত্রে অকিঞ্চন বাড়ী আসিল না, অবশ্য বাড়ীর কাহারও ভয়ে নহে, বাড়ী বলিয়া সুখের একটা বিঘ্ন রহিয়াছে এই রাগে···তার পরের দিনেও তার পাত্তা পাওয়া গেল না।

তৃতীয় দিনে যখন সে দেখা দিল তখন ব্যাপার কতক চুকিয়া গেছে—অর্থাৎ কিশোরী তখন পিত্রালয়ে। পূরা দুদিন কিশোরী কিছুই খায় নাই—প্রাণী একটা না খাইয়া সম্মুখেই মরে দেখিয়া জগবন্ধু তাড়াতাড়ি তাহাকে বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন—

কিন্তু ছেলের দিকে চাহিয়া তিনি মুখে ভৎর্সনা করা দূরে থাক্, ভাল করিয়া অর্থাৎ মন যেমন চায় তেমনি ভ্রূকুটি করিতেই সাহস পাইলেন না।

কাত্যায়ণী কিছু বলিলেন না—বধূ চলিয়া গেল, আসিবে কি না, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া রহিলেন—কিন্তু জগবন্ধুকে একটু বিচলিত দেখা গেল...তিনি পুত্রবধূকে যথার্থই স্নেহ করিতেন—তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তিনি, পুত্রের পিতা হিসাবে যতটা অসহায় বধূর কাছে ঠিক্ ততটা অপরাধী। তাঁর আরো মনে হইতে লাগিল, বধূ তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া যতদিন দূরে দূরে থাকিবে, তাঁহার অপরাধের পরিমাণ তত বাড়িবে। সুতরাং জগবন্ধু নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না; নিজেরই অপরাধ ক্ষালনের জন্য পুত্রবধূকে আনিবার প্রস্তাব করিয়া বৈবাহিককে এক পত্র লিখিয়া দিলেন...

কিন্তু তিনি ভাবেন নাই যে, তাঁহার প্রাণের আকুলতা—যাহা তিনি পত্রে প্রকাশ করেন নাই বলিয়া অদৃশ্য তাহা—এমন নির্ম্মম-ভাবে লাঞ্ছিত হইবে—

বৈবাহিকের জবাব যাহা তিনি পাইলেন তাহা এই: "আমার কন্যা বিধবা হইয়াছে, এমন কঠিন কথা আমি লিখিতে পারি না; তবে আমি মনে করিতে পারি, এবং আপনাকেও জানাইতে চাই যে, আমি তার বিবাহ দিতে পারি নাই।"

জগবন্ধুর অন্তর আশা করিয়াছিল, কন্যাকে স্বামীগৃহে পাঠাইবার প্রস্তাব সামাজিকভাবেই অগ্রাহ্য করা যায় না; তার উপর তাঁর নিজের বাৎসল্য প্রভৃতি সুকোমল অনুভূতি এবং বৃত্তি ওঁরাও হৃদয়ঙ্গম করিবেনই, কারণ ওঁরাও ছেলেপিলের মা বাপ্। কিন্তু ঐ জবাব আসিতেই তিনি যেন আচম্কা ঠোকর খাইয়া ছিট্‌কাইয়া উঠিলেন—তাঁর মাথা গরম হইয়া গেল; মাথায় চুল থাকিলে চুলও বোধ হয়

গরম হইত, কারণ আশাভঙ্গের ক্রোধ সামান্য জিনিষ নয়—সে বহু স্থান ছাপাইয়া বহুদূর ওঠে…

জগবন্ধু ক্রোধভরে মনে মনেই বলিলেন,—বটে ?

মনে মনে তিনি ঐ একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন, এবং যে-স্বরে তিনি তাহা উচ্চারণ করিলেন, নিজের হস্তে মত্ত হস্তীর শক্তি আর তার সঙ্গে দণ্ড দিবার দুর্দ্দান্ত হাতিয়ার না থাকিলে তেমন স্বর উঠিতে পারে না ; অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ তিনি সঙ্কল্প করিলেন, পুত্রের আবার বিবাহ দিবেন…

সঙ্কল্পের কথাটা যতই ভাবিতে লাগিলেন, সঙ্কল্পটা ততই দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল।

পত্রখানা হাতে করিয়া জগবন্ধু ত্বরিতপদে আর রাগে ফুটিতে ফুটিতে অন্তঃপুরে আসিলেন—এবং রাগের যন্ত্রণায় টাকে হাত দিতে তাঁর ভুল হইয়া গেল।

কাত্যায়ণীর হাতে পত্র দিয়া জগবন্ধু অতিকষ্টে দৈহিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন সেই মুহূর্ত্তটির জন্য যখন কাত্যায়ণীও অপমানে তাঁহার মতই আগুন হইয়া লাফাইয়া উঠিবেন…

কিন্তু জগবন্ধুকে আবার হতাশ হইতে হইল—কাত্যায়ণী তা উঠিলেন না ; পত্র পড়িয়া তিনি নিঃশব্দে স্বামীর হাতে ফেরৎ দিলেন—এবং জগবন্ধু যখন কঠোরস্বরে বলিলেন : "ছেলের আবার বিয়ে দেব"… কাত্যায়ণী তখন শান্তস্বরে বলিলেন : "না"।

জগবন্ধুর কথা পরে হইবে—

ওদিকে তাঁর বৈবাহিকের, অর্থাৎ কিশোরীর পিতা রাধাবিনোদের,

মনের উত্তাপ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল…চরম ঐ পত্রখানা ডাকে দিয়া হঠাৎ উদ্ঘাটিত একটা বীভৎস ভবিষ্যতের সম্মুখে তিনি যেন থমকিয়া গেলেন।

রাধাবিনোদ মনে মনে পত্রের মুশাবিদা করিয়া রাখিয়াছিলেন—অকিঞ্চনের বাবার পত্র যদি আসে তবে তাহার উত্তর কি দিবেন তাহা তিনি স্ত্রীর অজ্ঞাতেই সাজাইয়াছিলেন। স্ত্রীর মতামত সম্বন্ধে রাধাবিনোদ বড়ই অনিশ্চিত। রাগের মাথায় হেমশশী অনেকানেক দোর্দ্দাণ্ড বাক্য উচ্চারণ করিলেও, এবং সে রাগ এখনও তেম্‌নি অপরাজেয় প্রচণ্ড থাকিলেও, কিশোরীর আর স্বামীর ঘরে যাওয়া হইবে না, নারী হইয়া এবং জননী হইয়া স্বামীর কর্ম্মফলের এই বাস্তব রূপটা হেমশশী সহ্য করিতে পারিবেন বলিয়া রাধাবিনোদের মনে হইল না; স্ত্রীর মতামত গ্রহণ করিলেই ভাল হইত—একটা দিক্ সম্পূর্ণ বজায় না থাক্, নিরুপদ্রব থাকিত, ইহাই মনে করিয়া রাধাবিনোদ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন…চিরটাকাল সহধর্ম্মিণীর খোঁটার খোঁচা সহ্য করিতে হইবে—ইহাতে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। "আমি নির্ব্বোধ মেয়েমানুষ, তুমি ত' বুদ্ধিমান গৃহকর্ত্তা; মেয়ের ভবিষ্যৎ তুমি কেন ভাবিলে না?" —ইত্যাদি সব দোষারোপ, অনুযোগ আর ভৎ‍র্সনা নিয়ত বক্রকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া অশান্তির একশেষ করিয়া তুলিবে ইহা রাধাবিনোদের দিব্য চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট প্রতিভাত হইতে লাগিল।

কিশোরীকে স্মরণ করিয়াও তাঁর বুক ধুক্‌ধুক্ করিতে লাগিল…সে কাঁদিয়া আসিয়া পড়িয়াছে বটে—আসিবার পূর্ব্বে দু'দিন সে শ্বশুরালয়ের অন্ন স্পর্শ করে নাই—স্বামী দুশ্চরিত্র এবং দুর্ম্মুখ—এগুলি

বড় কঠোর সংবাদই...তথাপি রাধাবিনোদের এখন, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পত্রখানা ডাকে দিয়া মনে হইতে লাগিল, নিজের হঠকারিতার দ্বারা তিনি কন্যার পথ চিরদিনের জন্যই বোধ হয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন—নারী মাত্রেরই বাঞ্ছিত সেই পথটি। তাঁহারই দৃষ্টি এবং সহিষ্ণুতার অভাবে স্বামীগৃহে কিশোরীর আর স্থান হইবে না।

মনের এম্‌নি অনুতপ্ত আর শঙ্কাতুর অবস্থা লইয়া তিনি স্ত্রীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন—হাত জুড়িয়া দাঁড়াইলেন না, কিন্তু এমনভাবে প্রস্তুত হইয়া আসিলেন যেন হাত জুড়িতে বিলম্ব না হয়।

হেমশশী স্বামীকে দিন দুই বড় বমর্ষ আর চিন্তা-ক্লিষ্ট দেখিতেছিলেন—সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই স্বামীর কাতর মুখের দিকে চাহিয়া হেমশশী প্রশ্ন করিলেন,—কি?

রাধাবিনোদ বলিলেন,—আমি ত' এক কাজ করে বসেছি।

—কি কাজ?

—কিশোরীর শ্বশুরকে চিঠি লিখে দিয়েছি।

—কি লিখ্‌লে?

রাধাবিনোদ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন...

দুর্ব্বল আশ্রয়ে বসিয়া ঈশানের ঝড়ো মেঘের দিকে মানুষ যেমন করিয়া তাকাইয়া থাকে, তেম্‌নি শঙ্কাভরে আর অসহায় চক্ষে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রাধাবিনোদ বলিলেন,—লিখে দিলাম, আমার কন্যার বিবাহ যেন আমি দিতে পারি নাই; সে আমার ঘরেই চির-কুমারী...

বলিতে বলিতে তাঁর চোখ আসন্ন জলের জ্বালায় লাল হইয়া উঠিল।

—লিখে দিয়েছ ?

হেমশশীর প্রশ্নের সুরে ভর্ৎসনা ছিল না, কিন্তু যা' ছিল তা' তীক্ষ্ণ না হইলেও গভীর বেদনাদায়ক—তাঁর সুরে বাক্যাতীত এই অর্থটাই বাজিল, ফিরিবার পথ বুঝি রহিল না।

রাধাবিনোদ দু'বার মাথা নাড়িলেন—

জানাইলেন, লিখিয়া দিয়াছেন, এবং সেই লিখনকে ফিরাইবার পথ তাঁর কোনো দিকেই মুক্ত নাই।

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া হেমশশী বলিলেন,—ভালই করেছ—

বলিতে বলিতে তিনি থামিয়া গেলেন—সর্ব্বান্তঃকরণ যেন সর্ব্বতোভাবে সায় দিতে পারিলেন না।

স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের যে ধারণা, হেমশশীরও তাই। স্ত্রী স্বামীর অনুগত হইয়া থাকিবে; স্বামী ভালবাসে ভালই—না বাসিলেও পাতিব্রত্য বজায় রাখিতেই হইবে; মারধোর করিয়া লোহা পুড়াইয়া দাগাইয়া না দিলেই প্রেমের চূড়ান্ত হইতেছে মনে করিতে হইবে…স্বামীর চরিত্রগত অসাবধানতা ক্ষমার চক্ষেই দেখিতে হয়, কারণ নরকের দ্বার নারীর জন্য যত তৎপরতার সহিত উন্মুক্ত হইয়া যায়, পুরুষের বেলায় তত নয়। এই নিয়ম আর এই উপলব্ধি সংসারের লোকের একান্ত পরিচিত আর চির-আচরিত জিনিষ, এবং কল্যাণপ্রদ বলিয়া শ্রদ্ধেয়ও বটে।

এই সব সাধারণ তত্ত্ব হেমশশী বহুদিন হইতেই জানেন, শিক্ষাই তাই, এবং সে-শিক্ষা তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশিয়া আছে। তিনি জানেন, ইহার সঙ্গে বিরোধ করিতে গেলে কেবলমাত্র সাধ্বীর পথ

বিচ্যুতি ঘটে এমন নহে, সমাজের স্থিতি প্রগতি একেবারে নষ্ট হইয়া অনিষ্টের আর উচ্ছৃঙ্খলতার কিছু বাকি থাকে না। হেমশশী আরো জানেন, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার স্পর্দ্ধা যে করে সে দাঁড়াইয়া মরে…

তবু তিনি ইহাও জানেন যে, তাঁর নারীত্ব চিরকাল একটা সম্মান চাহিয়া ফিরিয়াছে—স্বাতন্ত্র্যের সম্মান, যাহা ভেলকী নয়, ভাণ নয়—ভীতি লালসা লোভ ধর্ম্ম কাল অনুগ্রহ নিন্দা প্রশংসা নিরপেক্ষ সম্মান—সমানের প্রতি সামীনের সম্মান—মাধুর্য্যময় রসমূর্ত্তির প্রতি রসিকের সম্মান—

এ-গুলি হেমশশীর অন্তরের নিগূঢ়তম কথা—

কাজেই, তাঁহারই কন্যা স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া চিরদিনের মত মানুষের লক্ষ্য, আলোচনার বস্তু, কথায় কথায় গরমিলের দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে…স্বামী ছাড়া অপরে সেই হিসাবে সে পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিবে…এই সব নিদারুণ সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াও স্বামীর চরম পত্র লেখার কাজটিকে তিনি অন্তরের অন্তস্তল ধিক্কৃত করিতে পারিলেন না—নিঃশেষে অনুমোদনও করিলেন না।

রাধাবিনোদ স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়াই পুনরায় বলিলেন, কাজ খুব খারাপ করে' ফেলেছি।

হেমশশী বলিলেন, এখনও ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনে।

অর্থাৎ ক্রিয়াটার ফলাফল কন্যার উপর কি-ভাবে প্রকাশ পায় তাহাই দেখিয়া ভাল-মন্দের বিচার করিতে হইবে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জগবন্ধুর মাথায় টাক আছে—কিন্তু তা' ছাড়াও তাঁর দাঁত উঁচু আর হা বড়—

তিনি হাসিলে মনে হয়, হাসিতে হইতেছে বলিয়া তিনি যেন কুণ্ঠিত—এম্‌নি অপ্রতিভের মত দেখায়। কবে তাঁহার মাথায় একটু টাক দেখা গিয়াছিল, সেটা আর বাড়ে নাই; কিন্তু জগবন্ধু তাহাকে যেন একটা অক্রেয় সামগ্রী মনে করেন; এম্‌নি স্নেহভরে তাঁর বাঁ হাতের তিনটি আঙুল সর্ব্বদাই সেখানে বিচরণ করে—যেন হাত বুলাইয়া তাহাকে ঠাণ্ডা রাখিতে চান।

কাহারো গায়ে ইস্তিরী করা শার্ট দেখিলে তাঁহার মনে হয়, লোকটা ফাজিল; আর, ফাজিলগুলি যে কেবলি লোক ঠকাইবার জন্ত ঘুরিতেছে ইহাতে তাঁহার সন্দেহ নাই। তাই তাঁর সর্ব্বদাই চঞ্চল ভাব; এবং এক তৃতীয় ব্যক্তি অপর এক তৃতীয় ব্যক্তিকে ধম্‌কাইয়া কথা বলিলে তাঁর ঘন ঘন প্লীহা চম্‌কাইয়া কোমরের কাপড় খুলিয়া খুলিয়া পড়ে।

ভুবন-কিশোরী-সংবাদের পর কিশোরী শ্বশুরবাড়ীতেই নিঃশব্দে শপথ করিয়া অন্নজল ত্যাগ করিলে জগবন্ধু দাঁত মেলিয়া দিশেহারা হইয়া গিয়াছিলেন খুবই, এবং বধূর জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হইয়া তাহাকে তাহার বাপের কাছে পাঠাইয়া দিয়া-

ছিলেন—তখন তাহাকে আপদ মনে করিতে তাঁর বাধে নাই। ইঙ্গীতে ভঙ্গীতে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ না করিলেও তিনি যে কঠিন ও ক্রূর হইতে পারেন সে পরিচয়ও পাওয়া গেল এই সম্পর্কেই। নিজেই গরজ করিয়া কিশোরীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার মনে হইল, কিশোরীই স্বামীকে পায়ে ঠেলিয়া গেল…অন্নজল গ্রহণ বিষয়ে শশুর-শাশুড়ী এবং প্রতিবেশীগণের প্রবোধ ও নিষেধ-বাক্য অবহেলা করার মধ্যে তিনি বধূর অপরিসীম যথেচ্ছাচারিতা এবং স্পর্দ্ধা দেখিতে পাইলেন…তাঁহাদের প্রতি বধূর অশ্রদ্ধা এবং মানহানি করিবার ক্লেশকর প্রবণতাও লক্ষিত হইল…

ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন—

স্ত্রীকে এবং দশজনকে ডাকিয়া বলিলেন,—বৃদ্ধ বয়সে এই শোক আমি সাম্‌লাতে বোধ হয় পারব না—বোধ হয় মারাই যাব…

এবং শান্তিপ্রিয় এবং তাঁহারই মৃত্যুভয়ে ভীত দশজনের পরামর্শে সন্ধি করিতে রাজি হইয়া বধূকে ফেরৎ পাঠাইবার জন্য তিনি বৈবাহিককে যে পত্র লিখিলেন তাহাতে সুমিষ্ট বিনয় বচন বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিলেও মৃত্যু-যন্ত্রণার ঝালও দিলেন প্রচুর—

লিখিলেন, "শ্রীমতী বধূমাতার এই আচরণটি তাঁহাদের মনঃপূত হয় নাই; হিন্দুস্ত্রীতে আর একটু সহ্যগুণ দেখিবার আশা তাঁহারা করিয়াছিলেন; এবং সে-আশা নিষ্ফল হওয়ায় তাঁহারা এত মনঃকষ্ট পাইয়াছেন যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তবে, অনেক হিন্দু-পরিবারে আজকাল ম্লেচ্ছাচার প্রবেশ করিয়াছে; মেয়েরা সেখানে ধর্ম্মশিক্ষা ত পায়ই না; সেখানে তাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানই বিকশিত হয় না।

বৈবাহিকের সদর ভাল, অন্দর পচা—আগে এই সমাচার জানিতে পারিলে ইত্যাদি…"

তারপর লিখিলেন, "তথাপি বধূমাতাকে আমি আনিতে চাই। আপনাদের মতামত সত্বর লিখিবেন।"

অনেক মাথা খাটাইয়া, দশজনের উপস্থিতিতে এবং সাহায্যে ঐ পত্র লেখা হইল ; কিন্তু, দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ, বলিয়া অভিজ্ঞানের যে বাক্যগুলি প্রচলিত আছে এক্ষেত্রে তাহা খাটিল না—

রাধাবিনোদের প্রত্যুত্তর অমানুষিক মনে হইয়া বাজিল তাঁর একারই, দশজনের নহে—পত্র লিখিয়া এই অপমান ডাকিয়া আনার জন্যে নিজেকে অবিবেচক নির্ব্বোধ মনে হইয়া তিনি লজ্জিতও হইলেন—

এবং রাধাবিনোদের বন্ধু হিসাবে নয়, বৈবাহিক হিসাবে, নির্য্যাতিত নির্দ্দোষী নিরীহ মানুষটি লজ্জায় ঘৃণায় রাগে জর্জ্জরিত হইয়া এমন করিয়া লাফাইতে লাগিলেন যে, বাড়ীর কুকুরটা পর্য্যন্ত তাঁর দুর্দ্দশা-গ্রস্ত মনের ঘ্রাণ পাইয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া কান্না জুড়িয়া দিল…

কাত্যায়নী কাঁদিতে লাগিলেন—

জগবন্ধু স্ত্রীকে অকারণে কাঁদিতে দেখিয়া ধমক দিয়া বলিলেন, চুলোয় যাক্…কেঁদ না।

কিন্তু ধমকের পর ধমক খাইয়াও কাত্যায়নী কিশোরীকে খুব অপরাধী করিতে পারিলেন না। নারীর বুকে বুকে নিভৃতে নিঃশব্দে

যে সুন্দর আকাঙ্ক্ষাটি লালন আর পালন মাগিয়া ফিরিতেছে, সেটা তাঁরও বুকে জাগ্রত। এই ঘটনায় তাঁর প্রকৃতি আহত হয় নাই, যেমন হইয়াছে গৃহকর্ত্তা জগবন্ধুর।

জগবন্ধুর ক্রোধ অন্ধ হইয়া উঠিল—

বৈবাহিককে তিনি পুনরায় লিখিলেন,—"আপনার কন্যা চিরকুমারী অবস্থায় আপনার গৃহেই অবস্থান করুক, এবং তাহাতে আপনার মর্য্যাদার বাড় বাড়ন্ত হউক, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আমি আর তাহাকে চাই না। তথাপি আমার স্ত্রীর কথা-মত মাঝের চৈত্র মাসটা আপনাদের সময় দিলাম; ইতিমধ্যেই বিবেচনা করিয়া যথা-কর্ত্তব্য করিবেন। আমি কিন্তু সকল দায়িত্ব হইতে মুক্তি লইতেছি। অতঃপর আপনার এবং আপনার কন্যার অনুতাপের সঙ্কটদিনে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিবেন না। কারণ, কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া আমাকে পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিতেই হইবে।"

পারিবারিক এই বিপাক উপস্থিত হইতেই দেখা গেল, বাড়ীঘর একই স্থানে নির্ম্মাণ করিয়া দলবদ্ধ হইয়া বাস করিবার মস্ত একটা সুবিধা আছে—সান্ত্বনা-বাক্যের অভাব হয় না। উঁহারা, অর্থাৎ জগবন্ধুর কাছাকাছি যাঁরা বাস করেন তাঁরা, জগবন্ধুর দুঃখে জগবন্ধুর চাইতেও দুঃখিত হইয়া কাঁদিয়া না ফেলিলেও, বিস্ময়ে এবং ব্যথায় যেন বদলাইয়া অন্য চেহারায় দাঁড়াইয়া গেলেন—এবং যে একটি বচন বহুবচনের ধারায় বিভিন্ন অবয়বে ও আয়তনে এবং অনুনাসিক প্রভৃতি সুরবৈচিত্র্যসহ নির্গত হইতে লাগিল তাহা এই যে, কলি এবার চারপো হ'ল...স্ত্রী কি না স্বামীকে ত্যাগ করে।

গতিহারা জাহ্নবী

বিস্ময়টা দুঃখকেও ছাপাইয়া নাকের ডগায়, চোখের তারায়, ঠোঁটের চূড়ায় উচ্ছ্রিত ভ্রূযুগে চিহ্নিত হইয়া দেখা দিতে লাগিল।

যেখানে অন্যায় অনাচার সেখানে হরিপ্রিয়া দেখা দিবেনই—সর্ব্বাগ্রেই দেখা দিবেন। এখানেও দেখা দিলেন; জাঁকিয়া বসিলেন; বলিলেন,—কাতু, আমি বলি, সে মেয়েকে আর কাজ নেই। বিজ্-বিজেপারা হ'য়ে থাকৃত—চিন্‌তে জোয়ায়নি। মাগো, এত তেজ তার মাগী হ'য়ে।···এ ব্যভিচার যদি ধর্ম্ম সয়, ত' তখন বলিস্ যে হরিবামুনি মিছে কথা বলেছে।—বলিয়া ব্রাহ্মণীর বাক্‌সিদ্ধির গর্ব্বে তিনি পা ফুলাইয়া বকরূপীধর্ম্মকে স্মরণ করিতে লাগিলেন··· স্পষ্ট যেন চোখে দেখিতে পাইলেন, বকরূপীধর্ম্ম লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া শনৈঃশনৈঃ অগ্রসর হইতেছেন—কিশোরীর আর নিস্তার নাই।

কাত্যায়ণী হরিপ্রিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক হইয়াছিলেন; তিনি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, সত্যই ধর্ম্মে ইহা সহিবে কি না। অধর্ম্ম এ ক্ষেত্রে কাহার বেশী সে-বিষয়ে তাঁর মনে মনে একটা অন্তবিহীন তর্ক আছেই—

বলিলেন—কাজ সে ভাল করেছে কি মন্দ করেছে তা' আমি জানিনে দিদি···

বলিতে বলিতে অতি অল্পদিনের পরিচিত সেই "বিজবিজে" মেয়েটির স্মৃতি তাঁর মনের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া বড় ঘোরাল' হইয়া উঠিল—তার আচরণে তিলমাত্র ত্রুটি বিকৃতি তিনি কোনদিন পান নাই; পদে পদে পাইয়াছেন, অতিশয় কোমল একটি অন্তরের; ভুলচুক দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অপরাধ নয়…অস্পষ্টতা, মনে মুখে দুই কখনো দেখেন নাই—বাধা তিনি পান নাই, বধূর বধূত্বে নিরাশ তিনি হন নাই…

মনে মনে সহস্রবার চম্‌কিয়া তিনি দাঁতে জিভ কাটিয়াছেন—ছেলের স্বরূপটি বধূর চোখের আড়ালে রাখিবার চেষ্টায় তাঁর অহোরাত্র বিশ্রাম ছিল না—মন অনুক্ষণ টন্‌টন্ করিত—সে ক্লেশ অল্প নয়, ভুলিবার নয়।

বলিলেন—তাকে আন্‌ব কি আন্‌ব না তা কিছু ঠিক করিনি।

এই বিষয়টিতে তাঁহার উক্তির প্রত্যুক্তিতে কাত্যায়ণীর মুখে দ্বিধার সুর শুনিয়া হরিপ্রিয়া ভ্রূভঙ্গী করিলেন; উষ্ণ হইয়া বলিলেন,—ভেবে ঠিক করতে হয় না কি ওসব? লোকে কি বল্‌ছে তা' বুঝি কানে যাচ্ছে না? অপদস্থ হবার কি কিছু বাকী আছে? লোকে ছি ছি করছে যে!

অন্যান্য লোকে যাহা বলিতেছে তাহার লজ্জা নিজের লজ্জার সামিল করিয়া লইয়া হরিপ্রিয়া যে কত উপকার করিতেছেন তাহা কাত্যায়ণী বুঝিলেন না—তিনি হরিপ্রিয়ার প্রশ্নমালা-শোভিত মুখমণ্ডলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না—

অপর পক্ষে হরিপ্রিয়াও কাত্যায়ণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,

কিন্তু নিষ্ক্রিয় অবস্থায় নহে—তিনি মাথা নাড়িতে লাগিলেন—সে মাথা নাড়ায় যত ছিল জ্ঞান তত ছিল ভর্ৎসনা; অর্থাৎ কাত্যায়ণী মুখে কিছু না বলার জন্যেই তিনি বুঝিয়া ফেলিয়াছেন যে, কাত্যায়ণীর নীরবতার অর্থ আর কিছুই নহে—কেবল ইহাই যে, লোকে কি বলিতেছে না বলিতেছে তাহা তিনি সামান্য গ্রাহ্য করেন। সকলেই জানে, সমস্যা এমন দুরূহ নহে যে, ভাবিয়া চিন্তিয়া, সমুদ্র সাঁতরাইয়া তাহার কুলকিনারা পাইতে হইবে। কাত্যায়ণীর এই চুপ করিয়া থাকার মানে, বউকে আবার আনার ইচ্ছা।

হঠাৎ রাগ অসহ্য হইয়া মুখ বিষ করিয়া হরিপ্রিয়া উঠিয়া পড়িলেন—বৌ-ঝিরা যেমন বে-আদপ, তথাকথিত গিন্নিরা ঠিক সেই পরিমাণ অপক আর বাহাত্তুরে—সামলান দায়।

দেশসেবাব্রতীরা যে দলেরই লোক হোক, আর যে মতই পোষণ করুক, দেশের সেবাই প্রত্যেকেরই লক্ষ্য। জগবন্ধুর অন্তঃপুরেও তেমনি একটা অকপট হিতৈষণার ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। যারা বধূকে পুনরায় আনিবার পক্ষপাতী এবং যারা তার বিরোধী তারা সংখ্যায় প্রায় সমান দাঁড়াইয়া গেল—এবং এই দুই পক্ষই আপন আপন মতের প্রতিষ্ঠাকল্পে এত বাক্য উচ্চারণ করিলেন যে, যে

বিবাহ লক্ষ কথা না হইলে সমাধা হয় না সেই প্রকার তিনটি বিবাহ সুসম্পন্ন হইতে পারিত—

জ্ঞানের কথাও কথিত হইল বিস্তর—এ-কালে সে-কালে তুলনা হইল বিস্তর—পাতিব্রত্য এবং গুরুজনের আধিপত্যের ও মর্য্যাদার গুণগান হইল বিস্তর...আরও কত যে কি হইল তাহার ইয়ত্তাই নাই, তবু কাত্যায়ণী দ্বিধার মধ্যেই রহিলেন—বিরোধীদলের শীর্ষস্থানীয়া হরিপ্রিয়ার পুরাতন বৈধব্য এবং অবিসম্বাদিত প্রভাব, ভূয়োদর্শন এবং অসহিষ্ণুতা সত্বেও কাত্যায়ণীর এই সন্দেহ ঘুচিল না যে, সত্যই কিশোরী অপরাধ করিয়াছে কি না।

হরিপ্রিয়া কাত্যায়ণীকে অভিসম্পাৎ দিতে দিতে থামিয়া গেলেন'

রাধাবিনোদের ছেলে গণপতি কলেজে পড়ে। সে দেশভক্ত, নিরপেক্ষ এবং স্বল্পভাষী; এবং সে আরো অনেক সদ্‌গুণে গুণান্বিত বলিয়া তার সত্যকার একটা নাম আছে।

রাধাবিনোদ তাহাকে এই পারিবারিক অকুশলের সংবাদটা দেন নাই; কিন্তু সে দু'দিনের ছুটিতে বাড়ী আসিবার পথেই অর্দ্ধেক ঘটনা শুনিয়া আসিল।

মায়ের পায়ের ধুলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াই গণপতি জিজ্ঞাসা করিল,—অকিঞ্চন নাকি খুকীকে ত্যাগ করেছে, মা?

কিশোরীর ডাক-নাম খুকী।

অকিঞ্চন খুকীকে ত্যাগ করে নাই; অন্ততঃ, গণপতির প্রশ্নের উত্তর তা-ই—কিন্তু সহসা হেমশশীর মুখ দিয়া সেই মুহূর্ত্তে যে উত্তরটা বাহির হইল তাহা সত্য। হেমশশী বলিলেন,—সে কি কথা! সে গ্রহণই করেনি' তা ত্যাগ করবে কি!

—কি রকম?

হেমশশী নিঃশব্দ রহিলেন—নিজেরই দৈবোচ্চারিত কথাটা কানে গিয়া তাঁর সম্বিৎ চম্‌কিয়া উঠিয়াছে। অকিঞ্চন স্ত্রীকে গ্রহণই করে নাই—যদিও সাতটি পাক ঘুরিয়া গেছে, মালা বদল হইয়াছে, গাঁটছড়া বাঁধা হইয়াছে, যজ্ঞ-ধূমের কজ্জল-তিলক পরাণ' হইয়াছে, মন্ত্রপাঠ হইয়াছে—অনুষ্ঠানের কথা ও ক্রটি অপূর্ণতা ঘটে নাই, তার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই; স্ত্রী গ্রহণের কৌশলগুলি পুতুলনাচের পালার মত ক্রমান্বয়ে দেখান' হইয়াছে, এবং হাজার লোকে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিয়াছে, তথাপি সব ব্যর্থ হইয়াছে—পুরুষহৃদয়টি মন্ত্রের অর্থ বোঝে নাই, প্রক্রিয়ার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই, গোত্রান্তরিত করিয়া স্ত্রী গ্রহণের উদ্দেশ্য অনুভব করে নাই—তখনও করে নাই, তাহার পরেও করে নাই—

এবং এই নিষ্ঠুর সত্যটা আজ অতি অকস্মাৎ অখণ্ডভাবে হেমশশীর অন্তরের কাছে ধরা দিয়াছে; তাঁর চোখে জল আসিল; বলিলেন,—তা-ই মনে হয়।

তারপর, অকিঞ্চন এই বাড়ীতে আসিয়া যত উপদ্রব করিয়া গেছে তাহা বলিলেন; কিশোরী যে কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া

জামাইকে তাড়াইবার কথা বলিয়াছিল, ছেলের অসন্তোষের ভয়ে তাহাও তিনি গোপন করিলেন না—

শুনিয়া গণপতি কিশোরীকে ডাকিল—

কিশোরী আসিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীর সঙ্গে ঘর করা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাহা লইয়াই আলোচনা হইবে—ইহাতে তার লজ্জা হইবার কথা; কিন্তু সলজ্জতা তার দেখা গেল না। স্বামীসঙ্গ লাভের যে মধুরশ্যামলস্মৃতি লজ্জায় রূপান্তরিত হইয়া নবোঢ়া তরুণীর মুখে চোখে রক্তিম হইয়া ফোটে, কিশোরীর সে স্মৃতির জগৎ প্রান্তরের মত নিঃস্ব, ফাঁকা—তার গভীরতম স্থলটি পর্য্যন্ত একেবারে শুষ্ক, বন্ধ্যা—সেখান হইতে রসপ্রবাহ উৎসারিত হইয়া তাহার মন আর্দ্র হইয়া উঠিল না···সেই রসেরই স্বাদানুভূতি চোখে মুখে লজ্জার আবরণ টানিয়া দেয়—

কিন্তু গণপতি কিশোরীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, সেখানে আর যা-ই থাক্ লজ্জার বিকার নাই।

বলিল,—বল্ সব কথা—কেন তুই অকিঞ্চনকে তাড়াবার কথা বলেছিলি?

কিশোরীর ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। কেমন করিয়া সুরু করিতে হইবে, সমগ্র জিনিষটা কিভাবে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে হইবে হঠাৎ সে তাহারই দিশা পাইল না; সে যতই নিঃসঙ্কোচ আর নির্য্যাতিতা হোক্, বেশী কথা বলিবার সহিষ্ণুতা তার নাই, সাধ্যই নাই; আর, সব কথা কি বলা যায়! ভাবিতে গেলে তা' যেমন দীর্ঘ অশেষ, বলিতে গেলে তা' তেমনি জটিল অব্যক্ত।

বলিল,—"তিনি অপরাহ্ণে"—

বলিতেই দৃষ্টি তার আপনিই নামিয়া আসিল—নিজের লজ্জায় নয়, অপরার লজ্জায়। পরপুরুষ সইকে উগ্র অবৈধ কামনার চক্ষে দেখিয়াছে, ইহা মনে পড়িতেই কিশোরীর সতীত্বজ্ঞানই আহত হইয়া তার চোখের পাতা টানিয়া নামাইয়া যেন বিশ্বের সম্মুখে একটা পর্দা টানিয়া দিল···

গণপতি নির্ব্বোধ নয়, বলিল,—তারপর?

—তারপর তিনি বাগ্‌দীপাড়ার একটা মেয়েকে···

হঠাৎ যেন পাষাণ চাপা পড়িয়া কিশোরীর কথা বন্ধ হইয়া গেল।

গণপতি বলিল,—যা।

কিশোরী চলিয়া গেলে হেমশশী বলিলেন,—জামাইয়ের বাবা জামাইয়ের আবার বিয়ে দেবে।

গণপতি বলিল,—দিক্।

কিন্তু গায়ের জোরে দিক্ বলিয়া গা ঝাড়িয়া দিলেই আন্তরিক সমুদয় ক্লেশ এবং বহির্ব্বিষয়ক ক্ষতিবৃদ্ধির যাবতীয় দুর্ভাবনা নিঃশেষ হইয়া ঝরিয়া যায় না।

হেমশশী অনেক কথাই ভাবিয়া দেখিয়াছেন—ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া উপায়ই নাই। তাঁহারা যতদিন বজায় আছেন ততদিন কোনো

ভাবনাই নাই—কিশোরী এবং আরো গুটিকতক কন্যা প্রতিপাল্য হইয়া থাকিলেও কিছু যায় আসে না; কিন্তু তাঁহারা চিরকালের জন্ম আসেন নাই—একদিন মরিতে হইবেই। তখন কি ঘটিতে পারে, ঘটিবেই নয়, ঘটিতে পারে কেবল, তাহাও হেমশশী স্থিরচিত্তে ভাবিয়াছেন। গণপতি তখন হইবে গৃহকর্ত্তা, তার স্ত্রী হইবে গৃহিণী; অর্থাৎ কিশোরীকে তখন উহাদের অধীনে থাকিতে হইবে—দাদা ও বৌদির অধীনে থাকাটাই যদি কিশোরী তখন নির্য্যাতন মনে করে! সত্যই যদি নির্য্যাতন সুরু হইয়া যায়!—আর কিছুতে না বাধুক, চক্ষুলজ্জার বাধা বড় কম বাধা নয়। তারপর, দাদা বৌদির মন রাখিয়া চলিতে চলিতে এমন একদিন যে আসিবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে, যে দিন দুঃসহ হইয়া এই দিনের এই কাজটিকে ভুল মনে করিয়া তাহার আত্মগ্লানি জন্মিবে না! তখন যদি সে তাঁহাদিগকেই সব অভাব অকুশল অশান্তির জন্ম দায়ী করে।

এই কথাগুলি হেমশশী গণপতিকে বলিলেন—

মায়ের মুখে ভবিষ্যৎ সম্পর্কীয় এই অকপট এবং সুসঙ্গত কথাগুলি শুনিয়া গণপতি থম্‌কিয়া গেল। এই বর্ণনাটির ভিতর তার নিজের সঙ্গে সংশ্রবযুক্ত যতগুলি কথা ছিল তাহাকে সে মনে মনে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও অনাগতা স্ত্রীর প্রতি তার মোহ বা পক্ষপাতিত্ব না থাকায় তার মনে হইল, এদিক্‌টা ভাবা দরকার; কারণ বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাহার আছে। তার স্ত্রী হইয়া যে আসিবে তার মতিগতি কিরূপ তাহা এখন নিশ্চয়ই অনুমানের বাহিরে—একেবারেই অজ্ঞাত। তাহার নজের শাসনের অবশ্য অভাব হইবে না; তথাপি মেয়েলী নির্য্যাতনের

যে-সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পন্থা আছে তাহাতে সেই নারীটি দক্ষ হইয়া আসিবে না তাহাই বা কে জানে! আর, কিশোরী যে পুরের কাছে আমরণ হাত পাতিয়া থাকিবে ইহাও অসাধারণ ক্লেশের কথা—উভয়তঃই।

বলিল,—'বড় গোলমাল,' মা। কিন্তু অমন চরিত্রহীন লোকের স্ত্রী সে, এ-কথা মনে করতেই আমার মাথা বেঠিক হয়ে উঠছে।...বাবা কি বলেন?

—তিনি চিঠি লিখে দিয়ে এখন কি করে' কথা ফিরোবেন তাই বোধ হয় ভাবছেন।

হিতৈষীগণের পরামর্শে এবং সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কিশোরীকে এই চৈত্র মাসটা এবং বৈশাখের প্রথম তারিখটা বাদ দিয়া শ্বশুরবাড়ীতে পাঠানই স্থির হইল।

রাধাবিনোদ ইহাই হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে জামাই আর একটা বিবাহ করিলে এই সঙ্কটটাই চিরদিনই উদ্যত হইয়া থাকিবে যদি কোনো কারণে কিশোরীকে কখনও স্বামীগৃহে পাঠাইতে হয় তবে প্রচুর কণ্টকে পরিপূর্ণ সতীনের ঘরেই তাহাকে পাঠাইতে হইবে। তাঁহারাই দুর্ব্বল পক্ষ। বন্ধুবিচ্ছেদের অজুহাতটাও যতই নির্জ্জীব হোক্ যেন তাঁর স্বপক্ষেই আসিয়া দাঁড়াইল।

হেমশশীও অগত্যা তাহাই বুঝিলেন—

গণপতিকেও তাঁহারা স্বমতে আনয়ন করিলেন—

কিন্তু পারিলেন না কিশোরীকে—সে বাধা হইয়া দাঁড়াইল। সহজ এই কথাটা তাহাকে কিছুতেই বুঝান গেল না যে, কাল কেবল বর্ত্তমানেই সীমাবদ্ধ নহে, ভবিষ্যৎ বলিয়া যে কালটা নিয়ত এবং

অবিরাম এবং অবশ্যম্ভাবী ভাবে অগ্রসর হইতেছে সে কি বস্তু দিতে আসিতেছে, আর কি বস্তু কাড়িতে আসিতেছে তাহা ঘুণাক্ষরেও ঠাহর করিবার উপায় নাই…

শুনিয়া কিশোরী ভয় পাইল না।

তাহাকে আরো বলা হইল যে, অন্ধকার ভবিষ্যতকেও সহজ দৃষ্টিতে যতটা দেখা যায় ততটা দেখিয়াই কার্য্যপ্রণালী স্থির করা ব্যতীত মানুষের আর কোনোদিকেই হাত নাই। অতএব…

ইহার উত্তরে কিশোরী বলিল,—দরকার হলে তখন সতীনের ঘরেই যাব। এখন এ কথা থাক্।

শুনিয়া ওঁরা নিশ্চিন্ত হইলেন, কি চিন্তিত হইলেন, তাহা ঠিক্ বুঝা গেল না।

কিন্তু একদিন ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন স্থুরু হইল।

স্বামী বর্ত্তমান থাকিতেও যে স্বামীতে বঞ্চিত সে কেবল যে হৃদয়ের দিক দিয়া অসম্পূর্ণ আর নিগৃহীত তাহা নহে—তাহার যন্ত্রণা অন্যদিকেও আছে—সেই যন্ত্রণাই অতর্কিতে একদিন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

বৈশাখ মাস পড়িয়াছে—

শ্বশুরবাড়ী হইতে মেয়ে আসিবার, শ্বশুরবাড়ীতে জামাই আসিবার এবং শ্বশুরবাড়ীতে বউ আসিবার সোরগোল চারিদিকেই শুনা যাইতেছে…চোখের সম্মুখে বরণ-ডালায় পুলকের শিহরণ বহিতে সুরু করিয়াছে—কানের পাশেই সহজ আনন্দের সুর বাজিতেছে…

কিশোরীর সহসা মনে হইল, দেশব্যাপী এই উল্লাসের আর উৎসবের মাঝে তাহার স্থান নাই—বান্ধবীরা তাহাকে যেন এড়াইয়া চলে; তাহাকে যেন তারা কৃপার চক্ষে দেখে…সে দুঃখ পাইবে বলিয়াই তাহার সখীরা তাহার সম্মুখে নিজের স্বামীর কথা উচ্চারণ করে না… ওদের দু'জনার নিভৃত সুখ আলাপন তাহার আগমনেই বন্ধ হইয়া যায়।…দেখিতে দেখিতে আর ভুগিতে ভুগিতে যেদিকে তার চোখ খুলিয়া গেল সেদিকে রসাবেশে বিভোর হইয়া হৃদয়ে হৃদয়ে মাল্য রচনা চলিতেছে না—সে দিকের দিকসীমানা পর্য্যন্ত মরুর মত রিক্ত, অগ্নি-নিঃশ্বাসে জর্জ্জরিত, অভাব-বিধুর…

সে যে অতি নিঃস্ব, একেবারে পরিত্যক্ত, একেবারে কাঙ্গাল—আর এই নিঃসঙ্গ নিঃস্বতার লজ্জা তাহাকে চিরকাল নিরর্থক একটি আবরণ দিয়া ঢাকিয়া ঢাকিয়া বহন করিতে হইবে ভাবিতেই একদিন কিশোরীর বুক ফাট ফাট করিয়া তার চোখের দৃষ্টি মুক্তজলের প্লাবনে ভাসিয়া গেল।

স্বামী-সম্পর্কিত যে লজ্জাটা এতদিন পদে পদে কেবলি ধিক্কার দিয়া দিয়া না না বলিয়া নিষেধের সুরে প্রতিবাদ করিয়াছে সে-ই যেন সুর পাল্‌টাইয়া কি বলিয়া ধম্‌কাইতে লাগিল—কিশোরী না পাইল তার অর্থ, না পাইল স্বস্তি।

অকিঞ্চন একদিন আচমকা বলিয়া বসিল,—বাবা, মানুষ চরিয়ে বেড়াই আমি; মেয়েমানুষের ধাত আমি চিনি; ছিঁচ্‌কে চুরিও করতে জানি, ডাকাতিও জানি। রাগ, বাবা, আমার ওপর খাটে না। বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া অকিঞ্চন তৃপ্তির হাসি হাসিতে লাগিল।

সুধীর বলিল,—মানে?

—মানে? মানে, ছাই। এই দেখ! বলিয়া অত্যন্ত জাঁকের সহিত একখানা খামের চিঠি অকিঞ্চন বাহির করিল।

বলা বাহুল্য, এই চিঠি কিশোরী লিখিয়াছে।

লিখিয়াছে: "তুমি নাকি আবার বিবাহ করিবে? কি অপরাধে আমাকে তুমি ত্যাগ করিলে, ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহা আমাকে যদি জানাও তবে সুখী হইব। তবে ইহাও নিশ্চয় যে, তুমি ভাল না হইলে তোমার কাছে আমি যাইব না, সকল লাঞ্ছনা সহ্য করিবার ক্ষমতা আমার হইবে।"

সহসা একদিন মাথার ভয়ানক গোলমাল হইয়া কিশোরীর আসন টলিয়া গিয়াছিল, কে যেন সেইদিন তাহাকে ধাক্কাইয়া লইয়া পরের স্থানে বসাইয়া তাহাকে দিয়া ঐ পত্র লিখাইয়া লইয়াছিল—সে যেন নিজে লেখে নাই।

কিন্তু আসল কথা এই যে, পত্রখানি সুচিন্তিত শান্ত কোমল ভাষায় লিখিত হইলেও, কিশোরীর মনের সুস্থতম কথা উহা কিছুতেই নয়—অকস্মাৎ আলোড়িত আব্‌হাওয়ার দিকবিদিকজ্ঞানহীন খেয়াল মাত্র। অকিঞ্চনের প্রতি মার্জ্জনার ভাব তার তিলমাত্রও জন্মে নাই। সখীগণের প্রাণ-হিল্লোলে যে মদমত্ততা আবর্ত্তিত রূপায়িত হইতেছে

সেখানে সে অপাংক্তেয়—তাহাদের সঙ্গে তার যোগ নাই—একটা নিষিদ্ধ সুদূর আর অস্বাভাবিক জগতে সে একা··

এই সঙ্গীহীন নির্জ্জনতাই এক সময় অসহ্য ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়া তাহার কেন্দ্রচ্যুতি ঘটাইয়া তাহাকে দিয়া এই পত্র লিখাইয়াছে··· তখনকার মত কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য যেন একটা আশ্রয়ের উপর দাঁড়াইয়াছিল—মনে হইয়াছিল, আরও দশ জনের মতই সে···এই প্রবঞ্চনাকে প্রবঞ্চনা বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া মন সুখী হইয়াছিল···

কিন্তু অকিঞ্চনের এত কথা জানা সম্ভব নয়; আর ইহাও সে জানে না যে; ঐ পত্র লিখিয়াছে বলিয়া কিশোরী আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেছে।

অকিঞ্চন নিজের জয় ঘোষণা করিয়া ইহাই বলিয়া আস্ফালন করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, মেয়েমানুষকে বাঁধিতে জানিলে সে পালাইবে কোথা!

সুধীর বলিল,—তাকেই আন্‌বি, না আবার বিয়ে কর্‌বি?

অকিঞ্চন বলিল,—বিয়েও করব, তাকেও আনব; সুবিধে পেলে লাভ ছাড়ব, এমন বেকুব আমি না। বলিয়া আরো একটা রমণী লাভের আশায় সে উৎসাহিত হইয়া রহিল।

কিশোরীর সেই পত্র কাত্যায়ণী দেখিলেন, জগবন্ধু দেখিলেন—দেখিয়া টাকে হাত দিলেন। উঁহারা বাড়ীর লোক; পত্র দেখিবেনই···

আরো অনেকে দেখিল—যার প্রাণে একটুখানি পরহিতৈষণা ছিল সে-ই আসিয়া পত্রখানা দেখিয়া গেল…এবং সবাই প্রায় এক্‌বাক্যে বলিয়া গেল, এই প্রকারের ধড়ফড়ানি যে একদা বাধিবে, বাধিতে বাধ্য, তাহা পূর্ব্বেই অনুমান করা গিয়াছিল।

হরিপ্রিয়ার কথা না বলিলেও চলে—তিনি না আসিয়া পারেনই না। তিনিও আসিলেন; বলিয়া গেলেন,—কাতু, নিয়ে আয় বউকে, কেলেঙ্কারী ঘুচুক—আর সয় না। বলিয়া তিনি লোকের কথায় অসহ্য জ্বালায় নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

কিন্তু এত আন্দোলন আর দেখাদেখির মধ্যে কিশোরীর পত্রের ভিতর অংশটা কাহারও তেমন বিবেচনাধীনে আসিল না। কিশোরী এ কথাও লিখিয়াছে:—"তুমি ভাল না হইলে আমি তোমার কাছে যাইব না।"

কেবল কাত্যায়ণী একবার বলিলেন,—ঐ যে লিখেছে, তুমি ভাল না হইলে—

জগবন্ধু তাঁর কথার মাঝখানেই হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—ওটা তোমাদের ইয়ে…

"অহমিকা" কথাটাই ঐ টানে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু কথাটা

শ্রুতিসুখকর হইলেও এই সংস্রবে কাজের নয় বলিয়া উচ্চারণ করিলেন না—তৎপরিবর্ত্তে বলিলেন,—মেয়েদের গোঁ আর আদর কাঁড়ান,' অভিমানিনীর অভিমান। ওর কোনো মানে নেই।...তারপর একটা গল্প মনে পড়িয়া জগবন্ধু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন...

কাদের এক জামাই গোঁসা করিয়া খাইব না বলিয়া জিদ্ ধরিয়া বসিয়া ছিল; তারপর ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করিতে থাকিলে কাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিয়াছিল, আর একবার ডাকিলেই যাইব।

কাত্যায়নী বলিলেন,—দিন ঠিক করেছ?

তাঁর আর তর্ সহিতেছিল না। পুত্রকে বধূ ক্ষমা করিয়াছে, স্বেচ্ছায় আসিতে চাহিয়াছে, কিশোরীর পত্রের এই মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সমস্ত বিক্ষোভ শান্ত হইয়া গেছে—ভবিষ্যতের ভয় আর অতীতের গ্লানি কাটিয়া তাঁর চতুর্দ্দিকেই সুনিবিড় শান্তি শীতলতা বিরাজ করিতেছে...উগ্র উৎকণ্ঠার যন্ত্রণার পর পুলকিত এই আবহে তাঁর বুক জুড়াইয়া মন যেন ডানা মেলিয়া আনন্দে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

জগবন্ধু তাঁর প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ১৮ই দিন ভাল আছে।

—অকিঞ্চন গিয়ে নিয়ে আসুক?

গতিহারা জাহ্নবী

—না, আমিই যাব। বলিয়া জগবন্ধু যে অর্থে একটু হাসিলেন তাহাতে কাত্যায়ণীর মুখের স্মিত উজ্জ্বলতার উপর ছায়া পড়িল।

অকিঞ্চন নিজকে জাহির না করিয়া ছাড়িবে না। কিশোরীর সেই দুর্ভাগ্য পত্রখানা লইয়া সে বাগ্দীপাড়াতেও হানা দিল। নারীর ক্রোধ অভিমান যে কত ভঙ্গুর, আর পুরুষের সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে সে কিরূপ আবদ্ধ তাহার দৃষ্টান্ত সকলেরই দেখা কর্ত্তব্য—ইহাই মনে করিয়া সে এক দিকে বিরিঞ্চি, বহু, প্রভৃতি রমণীগণকে সে-পত্র দেখাইতে আসিল; বিশেষ করিয়া ওরা, অর্থাৎ অন্তরের প্রিয় সঙ্গীগণ না শুনিলে বড়ই ফাঁকা ফাঁকা লাগে।···দ্বিতীয় কথা, এবং সেটাও একটা প্রধান কথা, ভুবনের প্রতি তাঁর আক্রোশ আছে—তাহাকেও কথাটা শুনাইতে হইবে।

অন্নদা, চম্পা, ভামিনী, প্রভৃতি যে যেখানে ছিল, রা পাইয়া অকিঞ্চনকে সবাই ঘিরিয়া ধরিল; বলিল,—বউকে আর নাকি নেবে না।

—নেব, নেব। রাগ করে বলেছিলাম রে; এখন আর রাগ নেই। তোরা সব গোপিণী আমার, তিনি আমার রাধা। কবে দেখবি কদমগাছে উঠে দিব্যি বসে আছি। ছবি দেখেছিস ত? ঠিক তেমনি করে’।

অন্নদার কাঁধে হাত দিয়া ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে যে দাঁড়াইয়া ছিল তারই নাম চম্পা—অকিঞ্চনের বিশেষ প্রিয় পাত্রী। চম্পার মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছিল; বলিল,—তখুনি বলেছিলাম, আসবে আবার। কেমন, সত্যি হ'ল ত'?…বলিয়া চম্পা আরো খানিক শুকাইয়া উঠিয়া নিজের কথায় হাসিতে লাগিল।

বহু জানিতে চাহিল,—কবে যাবেন আনতে?

—আমি যাচ্ছিনে সেদিকে। যেদিন খুশী যে-হয় আনবে।

—তখন আসবেন ত' এদিকে?

অনর্থক প্রশ্নটি করিয়া বহু যেন অনুকূল প্রত্যুত্তরটির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল—আর, মনে মনে হাসিতে লাগিল।

অকিঞ্চন ভামিনী প্রভৃতির দিকে চাহিয়া বলিল,—শোন্ কথা ন্যাকা মিন্সের! তোরা আমার আটপৌরে ঘর—সে থাকবে পোষাকী।

চম্পা চোঁপা নাড়িয়া বলিল,—হ্যাঁ তাই বই কি! তখন আমরাই হব পোষাকী—পালে পার্ব্বণে গায়ে উঠ্‌ব।

অকিঞ্চন বলিল,—তোর কথাগুলো ভারি ভাল লাগে।

গণপতি পড়িতে গেছে।

অসাধারণত্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া কিশোরীর অদৃষ্টের কথাটা প্রতি-দিনের কর্ত্তব্য আর ব্যস্ততার নীচে থিতাইয়া পড়িয়াছে—রাধাবিনোদ

এবং হেমশশী ভবিতব্যের হাতেই ঘটনাকে সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় ১৭ই বৈশাখ তারিখে সকাল আট্‌টায় জগবন্ধু দেবদূতের মত অত্যন্ত অকস্মাৎ রাধা বলিয়া ডাক দিয়া এবং টাকে হাত দিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁর আসিবার কোনই কথা ছিল না—এমন কি সম্ভাবনাই ছিল না—অকস্মাৎ তাঁহাকে অযাচিতভাবে উদিত হইতে দেখিয়া রাধা-বিনোদের বাড়ীর হাওয়াই যেন ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল অর্থাৎ কুটুম্বসমাগমে এমন ব্যস্ততা সেখানে দেখা দিল যাহার সীমা নাই—

রাধাবিনোদ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন—

অন্তঃপুরেও সাড়া পড়িয়া গেল—

রাধাবিনোদ পরম সমাদরে বৈবাহিককে সম্ভাষণ করিয়া ঘরে তুলিলেন…এবং তারপর উভয়েরই কথাবার্ত্তা শুনিয়া ইহা অনুভবই করা গেল না যে, মাঝখান দিয়া একটা দুর্য্যোগ বহিয়া গেছে।

রাধাবিনোদের প্রতিবেশী শ্রীনাথ সামন্ত তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন—এরূপ অবস্থায় তিনি কিরূপ আচরণ করিতেন তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

জগবন্ধুকে আপ্যায়িত এবং জলে তামাকে ঠাণ্ডা করিয়া রাধাবিনোদ সকৌতুকে প্রশ্ন করিলেন,—এমন হঠাৎ যে?

—আসতে নেই না কি? একেবারে বরখাস্ত ত' করনি'! বলিয়া জগবন্ধুও হাসিতে লাগিলেন।

বৈবাহিকের আগমনেই রাধাবিনোদ কৌতূহলী আর বিস্মিত হইয়াছিলেন যথেষ্ট; তার উপর তাঁর হাল্কা ধরণ আর স্ফূর্ত্তি দেখিয়া

রাধাবিনোদের কৌতূহল আর বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল—এত আনন্দের কারণ তাঁর বাড়ীতে কি ঘটিয়াছে !

জগবন্ধু বলিলেন, বৌমাকে অনেকদিন দেখিনি', মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে আছে। চল, দেখে আসি।

উভয়ে অন্তঃপুরে আসিলেন—

উঠানে দাঁড়াইয়াই জগবন্ধু ডাকিলেন,—বৌমা কই ?

কিশোরী আসিয়া দাঁড়াইল, শ্বশুরের পদধূলি লইল—জগবন্ধু তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় যুক্তাক্ষরবহুল সুদীর্ঘ আশীর্ব্বাদ করিলেন... তারপর তার মুখের দিকে খানিক নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া তীব্র একটা নিঃশ্বাস দমন করিলেন—

তাঁর সেই পুত্রের বধূ এ !

পরক্ষণেই জগবন্ধু মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিলেন,—চল বসিগে। বলিয়া পরম তৎপরতার সহিত রাধাবিনোদের হাত ধরিয়া তিনি টানিয়া লইয়া চলিলেন...যেন তাঁরই গৃহ, রাধাবিনোদ অতিথি।

অন্তঃপুরে রন্ধনের আয়োজন তুমুল বেগে চলিতে লাগিল...

বহির্ব্বাটিতে গড়গড়ার নলটা হাতে করিয়া জগবন্ধু খানিক নিস্পন্দ হইয়া থাকিলেন—কি ভাবিতে লাগিলেন তাহা তিনি জানেন না। পুত্রবধূর পূর্ণিমার মত আনন্দপ্রদ মুখখানা দেখিয়া আসিয়া পুত্রের

জনক হিসাবে নিজেকে তাঁর বড় অকিঞ্চিৎকর আর কৃপাপ্রার্থী মনে হইতেছিল—অথচ তাঁর দাবী প্রচুর এবং সে দাবী অন্যায় নহে ইহাই লোকে বলে। জগবন্ধুর মনে গোল বাধিয়া ভাবনা বড় এলোমেলো হইয়া গেল। তবু নিরাশ হইয়া ফিরিবার কথা তিনি ভাবিতে পারিলেন না—

কিছুক্ষণ তাঁর চোখ বুজিয়া কাটিল…

তারপর চোখ খুলিয়া বলিলেন,—তুমি নিশ্চয়ই ধোঁকায় পড়েছ! এই দেখ।

অর্থাৎ এই চিঠি পড়িলেই, এখন যাহা প্রহেলিকা মনে হইতেছে তাহার-সরল এবং যথার্থ উত্তর পাওয়া যাইবে।

কিশোরীর সেই বিপ্লব-আনয়নকারী চিঠিখানা বৈবাহিকের দরবারে দাখিল করিয়া দিয়া জগবন্ধু পুনরায় চোখ বুজিয়া নল টানিতে লাগিলেন…

রাধাবিনোদ পত্রখানা পড়িলেন; পড়িয়া বলিলেন,—"ভালই। কিন্তু…"কিন্তু" বলিয়া সুর টানিয়া যখন তিনি সুর টানা ছাড়িয়া দিলেন, দেখা গেল, জগবন্ধু তখন চোখ টানিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন—বিস্ময়ে তাঁর চোখের পাতা স্থির হইয়া আছে। তাঁর মনে হইল, রাধাবিনোদের তরফ হইতে এই সুন্দর পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাখ্যাত হইবে, কিম্বা কিন্তুর সুর উঠিবে, এ আশঙ্কা যে তিনি কল্পনাতেও করেন নাই।—

বলিলেন,—"কিন্তু" কি হে? "কিন্তু" বলে' তুমি সুর টান্‌ছ কি রকম?

রাধাবিনোদ বলিলেন,—কিশোরীকে নিতে এসেছ?

জগবন্ধু মনে মনে অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন ; বলিলেন,—তা-ই না হয় ধরে' নেও।

—একটা সর্ত্ত আছে যে ! "তুমি ভাল না হইলে আমি তোমার কাছে যাইব না।"—বলিয়া রাধাবিনোদ জগবন্ধুর মুখের দিকে যেন কেমন করিয়া চাহিয়া রহিলেন—যেন নিঃসন্দেহ হইতে চান, ভাল হইয়াছে কি ?

জগবন্ধু বড় দমিয়া গেলেন—চোখের পাতা তাঁর দ্রুতবেগে পাঁচ-সাতবার নামিল আর উঠিল ; টাকের উপর আঙুল বুলাইতেছিলেন, তাহা থামাইয়া বলিলেন,—তুমিও ও-কথা ধর্‌ছ নাকি ? ওটা মেয়েদের মামুলী বুলি।

কিন্তু, স্ত্রীর কাছে ঐ মামুলী বুলিকে গোঁ আখ্যা দিয়া উড়াইয়া দিয়া জগবন্ধু যেমন ঢালাও সুখ পাইয়াছিলেন, তেমন সুখ এখানে পাইলেন না—উপরন্তু একটা খট্‌কা বাজিল—ঐ মামুলী বুলিটাকে নাকচ করিয়া দেওয়া বুঝি সত্যই সম্ভব নয়।

রাধাবিনোদ বলিলেন,—কিশোরী যে এ-চিঠি লিখেছে তা' আমরা জানিনে ; কেন লিখেছে তাও বুঝতে পারলাম না। মোটের উপর বড় সুখের কথা যে, তোমরা বুঝেছ যে প্রকারান্তরে তোমাদের কাছে সে যেতে চেয়েছে। তবে, তার কাছে শোনা দরকার।

—চল শুনিগে। বলিয়া জগবন্ধু তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিবার ক্রম করিতেই রাধাবিনোদ বাধা দিলেন ; বলিলেন,—এখনই নয়। খাওয়া-দাওয়া করে' বিশ্রাম করো—ও-বেলা হবে'খন। বলিয়া সে প্রসঙ্গ তখনকার মত ত্যাগ করিলেন।

আহারে বসিয়া জগবন্ধুর সে কি হর্ষ, আর সে কি কলরব ! খাইতে

বসিয়া মানুষ রান্না উত্তম হইলে যে মাত্রায় আনন্দ প্রকাশ করে, জগবন্ধুর আনন্দের মাত্রা তাহাকে ছাড়াইয়া যেন আকাশে-বাতাসে খেলিতে লাগিল। হেমশশীর প্রত্যেকটি তরকারীর সঙ্গে স্বর্গস্থ অমৃতের তুলনা করিয়া জগবন্ধু বলিলেন,—বৌমা যদি এ-র সিকিও শিখে' থাকে তবে ঘরে বসেই আমার স্বর্গসুখ অনিবার্য্য।···খেয়ে যদি সুখ না পেলাম তবে বেঁচে-বর্ত্তে' সুখ কি! বল!

রাধাবিনোদ বলিলেন,—তা' বটে। তোমার বৌমাও শিখেছে।

—দু'একটা তরকারী বোধ করি তার হাতেরই।

—বল কি? বলিয়া জগবন্ধু তাঁর সানন্দ বিস্ময় প্রকাশ করিতে যত বড় করিয়া তাঁর হা মেলিলেন, সম্মুখের সব অমৃত একটি গ্রাসে মুখাভ্যন্তরে লইবার পক্ষে তার সিকিই যথেষ্ট।

তারপর জগবন্ধু বলিলেন—মায়ের পেটের মেয়ে—সব নেই ত' থোড়া থোড়া রান্নার হাত পাবেই। বলিয়া তিনি অধিকতর তৃপ্তির সহিত আহার করিতে লাগিলেন।

—তা' অসম্ভব নয়। বলিয়া রাধাবিনোদ হাসিলেন।

এইবার বক্তব্য সকলকার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিবার অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে মনে করিয়া জগবন্ধু আগে মুখ তুলিয়া একটা অনির্দ্দেশ্য স্থানের দিকে তাকাইলেন, তারপর বৈবাহিকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন—তারপর বলিলেন,—বেয়ান, বেয়ান বলেই বলি—তুমি আমার বন্ধু-পত্নীও বটে, আর রাধা বয়সে আমার বছর-দুতিনের ছোট; তাই তুমি তুমিই করলাম। তা' যা-ই হোক, বৌমাকে আমি নিতেই এসেছি।

তারপর একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন,—বৌমা নিজে যেতে' চেয়েছেন।

দরজার পাশেই আড়ালে হেমশশী দাঁড়াইয়া ছিলেন—স্বামীর মুখে কিশোরীর চিঠির কথা শুনিয়াও তিনি দ্বিতীয়বার অবাক হইলেন, আর কিছুতে নয়, কিশোরীর গোপনচারিতায়।

রাধাবিনোদ বলিলেন,—শুনেছে সব।

জগবন্ধু চাটনির বাটির ভিতর তর্জ্জনী ডুবাইয়া তর্জ্জনীটাকে বার কতক চুষিয়া বলিলেন,—বাঃ! চাটনি রাঁধতে হয় ত' এম্‌নি—ঝাল জ্বালা সব জুড়িয়ে গেল। রাধার ভাগ্যি ভাল। বলিয়া তিনি হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নিজের ভাগ্যে না হোক, অতিথির এবং কুটুম্বের সন্তোষে রাধাবিনোদ তৃপ্তিলাভ করিলেন।

জগবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—তা' মত্‌ ক ?

—তুমি বড় ব্যস্তবাগীশ।

—ছেলেবেলা থেকেই। তোমরা ত' ওই নিয়ে আমাকে যাচ্ছেতাই নিগ্রহ করতে—বল্‌তে তড়বড়ে জগো। বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন।

জগবন্ধুর অত কথা বলা স্বভাবই নয়; কিন্তু স্বভাববিরুদ্ধ বিপর্য্যয়ের আর দু'দিক বজায় রাখার টানাটানির মধ্যে পড়িয়া তিনি সযত্নে স্বীয় স্বভাবটিকেই বর্জ্জন করিয়া আজ এমন কলকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। সিদ্ধির যে উৎসাহ আর নিশ্চিন্ত নিশ্চয়তা লইয়া তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলেন, এখানে পদার্পণ করিয়াই তাঁর মনে হইয়াছে,

তার প্রত্যাশিত প্রত্যুত্তরটি, অর্থাৎ নিজের প্রাণের ধ্বনিস্পন্দনের প্রতিধ্বনি, যেন তিনি পান্ নাই। পত্র লিখিয়া খবর দিয়া তিনি আসেন নাই—মনে করিয়াছিলেন একেবারে আচম্‌কা গিয়া উঠিবেন; ভাবিবার চিন্তিবার সময় দিলে যে বাধার সৃষ্টি হইতে পারে তাহা ঘটিবার অবসরই দিবেন না; আর, সময় পাইলে দশজনের কুপরামর্শে মন বিগ্‌ড়াইতে কতক্ষণ! দৈবের হাতে আত্মসমর্পণ না করিয়া তিনি কাজের ভার তাই নিজের পুরুষকারের হাতেই দিলেন; তবে এক্ষেত্রে পুরুষকার মানে সুকৌশলে এমন একটি মানসিক অবস্থার প্রবর্ত্তন করা যাহার মধ্যে পড়িয়া সকলেরই মনে হইবে, আমরা ভালই আছি—কোনখানে কোনো গোলমাল নাই।

কিন্তু, এদিকে রাধাবিনোদ বৈবাহিক-সমাগমে যথোচিত কৃতার্থ জ্ঞান করিলেও যেন গা এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন; তিনি বলিতে পারিলেন না, "তুমি নিজে নিতে এসেছ—নিশ্চয় সে যাবে; আমরা তাকে পাঠাবই।" কই, তেমন গরজ ত' কিছুই দেখা যাইতেছে না। বরং "কিন্তু" বলিয়া সুর টানিতেছে; আর পিতা হইয়া মীমাংসা ভার দিতে চায় অজ্ঞান আর অভিমানিনী কন্যার উপর!

নিজের হাতে গড়া এই অবস্থাসঙ্কটে পড়িয়া জগবন্ধুর কোলাহল করা ছাড়া আর উপায়ই রহিল না—নিজের ফুর্ত্তি দিয়া তিনি অবিরাম নিজেকেই ঢাকিতে লাগিলেন; এবং বড় মুখ করিয়া বৌকে লইতে আসিয়া মুখ চুণ করিয়া ফিরিয়া যাইতে না হয় এই ভয়ে, চাটনি চাটিতে চাটিতেও তাঁর গলা শুকাইয়া উঠিতে লাগিল।...একা ফিরিয়া গেলে দেশেই মুখ দেখান ভার হইবে।

জগবন্ধুর গলায় হঠাৎ ভাত আটকাইয়া গেল

প্রচুর আহারের পর খানিক নিদ্রা উপভোগ করিয়া বৈকালের দকে জগবন্ধু বলিলেন,—চল বাড়ীর ভেতর, শুনে' আসি। তোমার ত' মতামত কিছুই নেই দেখছি।···কাল ১৮ই দিন ভাল আছে। কালই যেতে চাই।

রাধাবিনোদ বলিলেন,—এলে, দু'দিন থাক।

জগবন্ধু বলিতে পারিতেন: "যে রকম অমৃতোপম আহারের জুৎ তোমার বাড়ীতে, তা'তে দু'দিন কেন দু'মাস থাকৃতে পারি।" কিন্তু তিনি তা' বলিলেন না—তিনি সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছেন—মন ভাল লাগিতেছে না···বলিলেন, সে আর এক যাত্রায়। চলো।

রাধাবিনোদ এবং তাঁহার পরামর্শে হেমশশী কিশোরীর যাওয়া সম্বন্ধে কিশোরীকে তার মতামত জিজ্ঞাসা করেন নাই—পরামর্শ ত' দেনই নাই; অর্থাৎ তাঁরা নিরপেক্ষ আছেন। রাধাবিনোদ স্ত্রীকে কেবল বলিয়াছিলেন: "আমাদের সংস্রব শুধু এইটুকু যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াব না। সে যদি যেতে' চায় তা:—যদি না যেতে চায় তাতেও আমাদের আপত্তি নেই।"

রাধাবিনোদ এবং তাঁর পশ্চাৎ জগবন্ধু আসিয়া পূর্ব্ববৎ উঠানে দাঁড়াইলেন—জগবন্ধু আগাইয়া গেলেন; ডাকিলেন— বৌমা, শোনো।

কিশোরী আসিয়া দাঁড়াইল—

—বড় আনন্দ পেলাম, মা।—বলিয়া সুরু করিয়া জগবন্ধু টাকে আঙুল দিয়া বলিতে লাগিলেন,—তুমি চলে' আসার পর থেকে আমি আর তোমার শাশুড়ী কত কষ্ট পেয়েছি তা' ভগবান জানেন—নানাদিক থেকে' নানান্ কষ্ট পেয়েছি···তারপর ভাবলাম, মায়ের আমার যেমন রূপ, তেমনি গুণ ; সে রাগ করে থাকবে ক'দিন ! বেটি আসবেই আবার এই ছেলেটাকে মানুষ করতে। ভগবান তোমায় সুমতি দিয়েছেন ; তোমার যাবার ইচ্ছে হয়েছে দেখে বড় আনন্দ পেয়েছি। বলিয়া আড়ালে যেখানে বেয়া'ন অবস্থান করিতেছিলেন সেইদিকে একবার এবং বেয়াইয়ের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন···

ওদিক অদৃশ্য—

এদিকে বেয়াইয়ের মুখে কোনো ভাবই লক্ষণযুক্ত নয়—তিনি যে নিঃস্বার্থ তৃতীয় ব্যক্তির মত বাক্যহীন হইয়া অভিনয় দেখিতেছেন···

এই নির্লিপ্ততা আর নীরবতার মাঝে পড়িয়া হঠাৎ জগবন্ধুর মনে হইল, তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া সবাই পরিত্যাগ করিয়া গেছে—তিনি সম্পূর্ণ নিরুপায়—তাঁর একমাত্র অবলম্বন ঐ মেয়েটি—ওরা পর—বধূ আপনার জন—সে-ই যদি করুণা করে···

জগবন্ধু হাতের উল্টাদিক দিয়া অকারণেই কপালটা একবার মুছিয়া লইয়া ব্যাকুল হইয়া বলিলেন,—বৌমা, কালই যাব।

কিশোরী কথা কহিল ; বলিল,—আমি যাব না।

যেন তীর আসিয়া বুকে বিঁধিল—

—সে কি ? বলিয়া ঐ ছুটি একাক্ষরিক শব্দে জগবন্ধু যে বেদনা আর বিস্ময় নিনাদিত করিয়া তুলিলেন তাহার বর্ণনা নাই।

কিশোরী মুখ নীচু করিয়া বলিতে লাগিল,—আমার চিঠি আপনারা ভুল বুঝেছেন।...তিনি যেদিন ভাল হবেন, সেইদিন এসে আমায় নিয়ে যাবেন; গিয়ে আপনার বাড়ীতে দাসী হ'য়ে থাকব, বউ হ'য়ে নয়।

বলিয়া কিশোরী বিদায় লইতে গেলে, অর্থাৎ হেঁট হইয়া শ্বশুরের পদধূলি লইতে গেলে, জগবন্ধু লাফাইয়া পিছাইয়া গেলেন,—"থাক্ থাক্।"

আর তিনি পদধূলি দিতেই রাজি নন।

বলিলেন,—তবে এ চিঠি লিখেছিলে কেন?

অর্থাৎ, পত্নীত্যাগের দায়িত্ব আমার পুত্রের স্কন্ধে চাপাইতে চাহিয়াছ কেন?

—তা' আমি বলতে পারব না। বলিয়া কিশোরী আর একবার পদধূলি গ্রহণ করিবার চেষ্টা না করিয়া আস্তে আস্তে ঘরে উঠিয়া গেল।

জগবন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া রাধাবিনোদেরই মমতা জন্মিল; বলিলেন,—এস।

জগবন্ধু চলিতে লাগিলেন, কিন্তু যেন অজ্ঞান অবস্থায়; তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন বলিলে কিছুই বলা হয় না—তিনি আশাহত হইয়াছেন বলিলেও অল্প বলা হয়...তিনি আজন্ম যে সংস্কারটিকে লালন করিয়া প্রাণের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লইয়াছিলেন সে-ই যেন মুমূর্ষু হইয়া উঠিল—সে-ই যেন তাঁর বুকের ভিতর লুটাইয়া লুটাইয়া রক্তবমন করিতে লাগিল...তিনি যে পুরুষ, পুত্রের পিতা, বধূর শ্বশুর, স্ত্রীর স্বামী, এই গর্ব্ব আর গৌরব আর অহঙ্কার ধূলিসাৎ হইয়া ত'

গেলই—তিনি যে মানুষ এই জ্ঞানটাই অসহ্য উত্তপ্ত একটা নিঃশ্বাসে পুড়িয়া এক নিমেষে ছাই হইয়া গেল।

উভয়ে গিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন—

ভৃত্য তামাক দিয়া গেল, জগবন্ধু তাহা স্পর্শ করিলেন না।

রাধাবিনোদ বিষণ্ণকণ্ঠে বলিলেন,—আমি, ভাই, নিরুপায়।

জগবন্ধু কথা কহিলেন না।

তারপর রাধাবিনোদ তাঁর প্রস্থানের উদ্যোগের দিকে ম্লানচক্ষে চাহিয়া রহিলেন···থাকিতে থাকিতে এক সময় বলিয়া উঠিলেন,—এ বেলাটা থেকে' যাও ভাই।

জগবন্ধু কেবল বলিলেন,—না।

জগবন্ধু স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কুটুম্ব-গৃহ হইতে অনেকেই প্রত্যাবর্ত্তন করে, এবং অন্যান্য স্থান হইতেও করে—সর্ব্বনাশের পর শ্মশান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে—সর্ব্বস্ব পরের হাতে তুলিয়া দিয়া আদালত হইতে করে—মৃত্যু ঘটিতে পারে জানিয়াও করে—প্রত্যাবর্ত্তন করা-না-করা সমান জানিয়াও প্রত্যাবর্ত্তন করে; তবু তাহা যেন স্বাভাবিক একটা সীমার বাহিরে যায় না। কিন্তু জগবন্ধুর এই প্রত্যাবর্ত্তনের যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে—সাধারণ, স্বাভাবিক এবং সর্ব্বাবয়বে প্রত্যাবর্ত্তন ইহা নহে—তাঁহার সারাংশ খানিক ছাঁটিয়া দিয়া পরিধির সীমার বাহিরে তাঁহাকে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। জগবন্ধুর মনে হইতে লাগিল, দু' পায়ে হাঁটা একটি সম্পূর্ণ মানুষ তিনি নন্—যদিই বা পূর্ব্বে ছিলেন, কিন্তু এখন আর তিনি তা' নন্। তাঁর আরও মনে হইতে লাগিল, তিনি পঙ্গু একটি লোক এবং গজভুক্ত কপিত্থবৎ অসার

একটি বস্তু—তাঁহার জীবনের সমস্ত রস তীব্র একটা শোষণে বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে—নিজেকে মানুষ বলিয়া চিনিতে তিনি পারিতেছেন না… তিনি আর অন্তঃপুরে যাইবেন না, স্ত্রীকে এ মুখ আর দেখাইবেন না, পুত্র অকিঞ্চনের মুখ আর দর্শন করিবেন না, এবং আগুন লাগাইয়া বাগ্‌দীপাড়া পুড়াইয়া দিবেন। কিন্তু তাহাতেই বা কি ফল হইবে? যাহারা তাঁহাকে অপমান করিয়াছে, মানুষ মনে করে নাই, তাহাদের তাহাতে কি ক্ষতি হইবে? কিছুই না।…তাঁর অন্তরের জ্বালা যেমন তাদের অন্তর স্পর্শ করিতেছে না, তেম্‌নি বাগ্‌দীপাড়ার আগুনের আঁচ তাদের গায়ে লাগিবে না…

জগবন্ধু শুইয়া পড়িলেন—

আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলেন—সেইখানেই শুইয়া পড়িলেন।

কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরে না গিয়া বৈঠকখানায় অদৃশ্য হইয়া থাকার সঙ্কল্প টিকিল না। ভৃত্য তাঁহার আগমন-সংবাদ অন্তঃপুরে রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছিল—সে-ই আসিয়া খবর দিল,—বাবু, মা ডাক্‌ছেন।

জগবন্ধু বলিলেন,—যাই।

বলিয়া কষিয়া বসিলেন; কারণ, তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হইল, আসিয়াই ভিতরে না যাওয়া অন্যায় হইয়াছে। স্ত্রীর মত সান্ত্বনার স্থল আর কোথায়? অর্থাৎ নাই। ধর্ম্ম এবং মর্ম্ম জুড়িয়া যিনি বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে মর্ম্মবেদনার অংশ সর্ব্বাগ্রে দেওয়া তাঁর কর্ত্তব্য। তিনি অভাগা—তাঁর স্ত্রীও তাহা হইলে অভাগী—উভয়েরই অদৃষ্ট এক সঙ্গে গাঁথা।

জগবন্ধু উঠিয়া দাঁড়াইলেন—টাকে হাত দিলেন, এবং যদিও পা চলিতেছিল না তথাপি পদব্রজেই অন্তঃপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন…

—কি হ'ল ?

কাত্যায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন বটে, কিন্তু জানিতে কি তাঁর বাকি ছিল যে, কর্ত্তা একাই ফিরিয়াছিল, বধূ আসে নাই। তবু, কি অবস্থায় কি বিঘ্ন ঘটিল তাহা জানিতে উৎকণ্ঠা হয় বৈ কি।

জগবন্ধু স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছুই বলিলেন না···এবং তারপরই স্ত্রীকে অতিক্রম করিয়া শয়নকক্ষের দিকে চলিতে লাগিলেন...

খানিক দূর গিয়া বলিলেন,—বৌমা এল না।

কাত্যায়ণী বলিলেন,—আস্‌বে আমি আশাও করিনি।

জগবন্ধু বলিলেন,—তুমি দেখ্‌ছি বৌয়ের দিকে। কিন্তু আমাকে যে-অপমানটা হ'তে হ'ল তার দাম দেয় কে ?

জগবন্ধুর মনে হয়, যে-ক্ষতিটা অপূরণীয় বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, অপরের সে বিশ্বাস না-ও হইতে পারে, তাহার কাছে মূল্যের উল্লেখ করিলেই তার মনে হইবে ব্যাপারটা যথার্থ বটে, অতএব সে তাঁহার মতে মত দিবেই। কিন্তু কাত্যায়ণী অত্যন্ত দৃঢ় প্রকৃতির মানুষ। অপমানের দামের উল্লেখ—অর্থাৎ, সে মূল্য দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই জানিয়াও—কাত্যায়ণী পরাজয় মানিলেন না; বলিলেন,—তোমার ছেলে যে তোমাকে আমাকে উঠ্‌তে বস্‌তে অপমান কর্‌ছে তার দাম তুমি চাইবে কার কাছে ?

নিদারুণ অভিমানে জগবন্ধু বলিলেন,—আমি মরব। বলিয়া ঘরের ভিতর উঠিয়া গেলেন।

স্বামীর প্রাণেই এই অপমানপুঞ্জের একমাত্র মূল্য, এবং তাহাই তিনি দান করিবেন, এই সমাচার অবগত হইয়াও কাত্যায়ণী

অস্থির হইয়া উঠিলেন না; স্বামীর কুশল সমাচার লইতে তিনি ঘরে ঢুকিলেন; দেখিলেন, তিনি চেয়ারে বসিয়া আছেন, এবং সত্যই তাঁহাকে নির্জ্জীব দেখাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার শরীর ভাল আছে ত'?

—আছে বৈ ক

—কি হ'ল সেখানে?

—পুতুল নাচ। বৌমা বল্লে, আমি যাব না।

—তার বাপ্ মা রাজি ছিল?

—জানিনে ঠিক। ছিল বোধ হয়।

—মন খারাপ করে' থেক' না। বুঝে দেখ সমস্তটা।···আমার মন ত' কিছুই খারাপ লাগ্ছে না।

—তুমি বোধ হয় সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রীর অংশ—অল্পে টলো না। বলিয়া জগবন্ধু মুখ ফিরাইয়া রহিলেন; কাত্যায়ণী এই অনাবশ্যক বিদ্রূপে একটু হাসিলেন মাত্র।

জগবন্ধুর এই দুঃখই সকলের বড় হইয়া উঠিল যে, তাঁহার অন্তরের নিঃশ্বাসটি কেবল তাঁহারই কাছে সত্য হইয়া রহিল—পৃথিবীর আর কেহই তাহাকে জানিতে চাহিল না, এমন কি স্ত্রীও না।···স্ত্রীকে সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রীর অংশ বলিয়া বিদ্রূপ করিলেও পুত্রবধূকে তিনি লক্ষ্মীস্বরূপিণী মনে করেন—এই কথাটি অত্যন্ত জাগ্রত কথা; তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন—এত স্নেহ করেন যে, বৌমা মাটিতে পা দেয় এ ইচ্ছা নয়।···পুত্রবধূ করিয়া যাহাকে গৃহে আনিবেন তাহার একটি আদর্শ তিনি নিজের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, বহুদিন

পূর্ব্বেই। কিশোরীকে পুত্রবধূরূপে পাইয়া একদিকে তাঁহার কন্যাসন্তনা-কাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি এবং অন্যদিকে তাঁহার আদর্শের প্রতি লুব্ধতার পরিতৃপ্তি ঘটিয়াছিল—এসব কথা তিনি ভাবে আভাসে প্রকাশই করিয়াছেন; তবু কেহই তাঁহাকে বুঝিতে পারে নাই, বা ভুল বুঝিয়া বিদ্ধ করিয়াছে।...তিনি যখন কিশোরীকে আনিতে যান্ তখন তাঁর কাজটাকে কেহ মতিভ্রম মনে করিবে এ আশঙ্কা তিনি করেন নাই।...সকলের চাইতে মর্ম্মান্তিক কথা এই যে, তাঁহাকে নিরাশ করিতে হইলে যতটা নির্ম্মম হইতে হয়, ঠিক ততটাই নির্ম্মম হইয়া সকলে তাঁহাকে আঘাত করিতেছে; তাহা কেবল তিনিই অনুভব করিতেছেন—আর কেহ করিতেছে না। শোকের উপর শোক আরও গভীর হইয়া উঠিল এই কারণেই যে, তাঁর স্ত্রীও যেন তাঁর মর্ম্মের সঙ্গিনী নন্, পর—পরের মতই তাঁর অবিচার এবং অন্ধতা।...অথচ এই সব কথা এখন ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইতে গেলে অর্থাৎ কষ্টের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করিতে গেলে তাঁহার পক্ষে যে পরিমাণ বাক্য-ব্যয়ের প্রয়োজন এবং শ্রোতার পক্ষে যে পরিমাণ অনুকম্পা, সহিষ্ণুতা এবং একাগ্রতার প্রয়োজন তাহা এক পক্ষে দুঃসাধ্য, অন্য পক্ষে দুর্ল্লভ—এ-দু'টির একত্র সম্মিলন একেবারেই অসম্ভব।...এ-সব হৃদয়ের ব্যাপার এক নিমেষে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া সহজ অনুকম্পায় ব্যথার ব্যথী হইতে হয়—তাহা যে না পারে তাহার সঙ্গে এ সব নিগূঢ় বিষয়ে আলাপনই নিষ্প্রয়োজন...

সুতরাং জগবন্ধু যন্ত্রণায় ঝিমাইতে লাগিলেন এবং সকলের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রহিলেন...

বলিলেন,—পরে হবে। এখন যাও।

কাত্যায়ণী চলিয়া আসিলেন।

কাত্যায়ণী অনেকক্ষণ স্বামীর সঙ্গে আর দেখা করিলেন না। ধীরে ধীরে তিনি স্বামীর প্রতি অনুকম্পা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিশোরীর আসা সম্বন্ধে তিনি আশা করিয়াছিলেন কতটা তাহা বলা শক্ত, কারণ তিনি কিশোরীকে চিনিয়াছিলেন। জগবন্ধু বধূকে আনিবার জন্য নাচিয়া উঠিলে তিনি বাধা দিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া দেন নাই, বরং স্বামীর উৎসাহের ছোঁয়াচ লাগিয় তিনিও কিছুক্ষণের জন্য নিজের কাছে উদ্‌ঘাটিত সত্যটিকে ভুলিয়া গয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন, ডাক দিলেই আসিবার মেয়ে সে নয়.. তিনিও নন্। আত্মপ্রিয়তা বেশী থাকিলে তিনিও বধূর প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন বোধ হয়, কিন্তু বধূকে পুরুষের স্ত্রী হিসাবে নিজের স্থান মর্য্যাদার বাহিরে আনিয়া স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে তিনি পারিলেন না—পুরুষের স্ত্রী হিসাবে প্রত্যেক নারীর যে সংস্থাপনা ঘটে তাহা একই, সর্ব্বক্ষেত্রেই তাহা একই নিয়মের বশীভূত।

বধূ আসিল না বলিয়া পুত্রের মন খারাপ হইয়া যাইবে, ইহা তাঁহার মনে হইল, কিন্তু তাহাতে দুঃখিত হইবার কারণ তিনি দেখিতে পাইলেন না···পুত্রকে তিনি বহু পূর্ব্বেই নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন—তাহাকে নিজেদের দলভুক্ত করিয়া রাখেন নাই—পারিবারিক মান-

মর্য্যাদার বিচার এবং রক্ষার চেষ্টা যেন তাঁহাকে বাদ দিয়াই করিতে হইবে। কাত্যায়ণীর মনে হইল, এ হিসাবেও বধূ ঠিক করিয়াছে—আসা তার উচিত হইত না। সে আসিলে তাহার আসার সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা ইতরতার স্তরে সবাইকেই নামিয়া যাইতে হইত, যাহার ভিতর হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার শক্তি কাহারও নাই।...তাঁহারা ভদ্র আখ্যার বহির্ভূত হইয়া যান নাই—বধূ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে ধারণ করিয়া আছে।...বধূ তার স্বামীকে, তাঁহাদের পুত্রকে ত্যাগ করিয়াছে—সমাজে অপাংক্তেয় দিবার ভয় তাহাতে নাই। যদি তাঁহাদিগকে অপাংক্তেয় করিবার বুদ্ধি সমাজের মস্তিষ্কে কখনও জাগ্রত হয় তবে তাহা পুত্রের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়াই হইবে—বধূর ব্যবহারে নয়। অতএব সতী মেয়ে চিরজীবিনী হোক।

নবযৌবনসম্পন্না সুন্দরী স্ত্রী পিত্রালয় হইতে আসিতেছে এবং দীর্ঘ বিরহ যাপনের পর তাহার সঙ্গে মিলন হইবে এই আশায় অকিঞ্চন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল—এবং বাহিরে গল্পও করিয়াছে ঢের। স্নিগ্ধ একটু আলাপ করা, নিরর্থক বাক্যবিনিময়, কথার কৌশলে কথাকে

শতেক ভঙ্গীতে রূপায়িত করা, হাসির চতুরতায় হাসিকে অসীম করিয়া তোলা—তাহাকে অমূল্য করা, ইত্যাদি প্রাণ-বিনিময়ের লক্ষণগুলি অকিঞ্চনের দাম্পত্য-ব্যবহারে দেখা যায় না। সে মোটা কথা জানে, মোটা কথাই বলে—মোটামুটি তার আকাঙ্ক্ষা—খানিকটা ইয়ার্কি দিতে আর টানাটানি করিতে সে জানে—তাহাই সে করে। তবু, স্ত্রী আসিতেছে, অতএব পরিপাটি হইয়া স্ত্রী-সম্ভাষণে যাইতে হইবে—তাহার আয়োজন সে করিয়াছে—চুল কাটাইয়াছে এবং মুখে মাখিবার জন্য স্নো কিনিয়াছে।

জগবন্ধু বিশ্রাম করিতেছেন, অপরা ঝিমাইতেছেন, কাত্যায়নী রন্ধন করিতেছেন, এবং বাড়ীর আবহাওয়া যখন একটুও প্রীতিকর নহে তখন অকিঞ্চন পাড়ার সফর শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিল। দেখা গেল, তাহার হাতে স্নো রহিয়াছে। সুঘ্রাণ যুক্ত এবং সুপরিচ্ছন্ন মুখখানা সে স্ত্রীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিবে এই ছিল তার অন্তরের একান্ত বিলাসাভিলাষ, কিন্তু দৈবের এমনি চক্র যে, তার সে অভিলাষ পূর্ণ হইবার নয়।

বাড়ী ঢুকিয়াই অকিঞ্চন দেখিল, বাড়ীর বিড়ালটি অঙ্গনে বিচরণশীল একটি শালিখের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে...শালিখ উড়িয়া আসিয়া আমড়াগাছের ডালে বসিল—বিড়াল দৌড়াইয়া গাছের তলায় আসিয়া উপরের দিকে হা করিয়া তাকাইয়া রহিল...

অকিঞ্চন হাসিয়া বিড়ালটাকে বলিল,—শালা। তারপর ডাকিল—মা ?

—কেন ?

—বৌ এসেছে?

—না।

—কেন?

এ প্রশ্নের কোনও জবাব আসিল না। অকিঞ্চন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—বাবা কোথায়?

—ঘরে আছেন। বলিতে বলিতে কাত্যায়ণী রান্নাঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, তাঁর সঙ্গে এখন দেখা ক'রো না।

—বটে! কেন?

—তাঁর মন ভাল নেই।

—বৌ কেন তাঁর সঙ্গে এল না তা-ও জিজ্ঞাসা করতে বারণ নাকি?

—তা এখন ক'রো না। তোকে বারণ করছি এ-সব কথা এখন থাক্।

—তবে থাক্, আমি চল্লাম। তোমাদের যদি এতই কদর হয়ে থাকে যে, কথার জবাব দিতেই গররাজি তবে আমি বেরুলাম। এমন কি ঘটেছে তা তোমরাই জান, বাপু; একেবারে আড়ষ্ট মেরে বসে' আছ।

এই সময়ে জগবন্ধু ঘরের ভিতর খুক্ খুক্ শব্দ করিয়া একটু কাশিলেন—

শুনিয়া অকিঞ্চন যেন আহ্লাদিত হইয়া উঠিল, হাসিয়া বলিল, —ঐ যে জিব্ নড়ছে। আমি ভাবছিলাম, বা অন্তর্জ্জলীই করতে হয়।

বলিতে বলিতেই এক নিদারুণ কাণ্ড ঘটিয়া গেল—যা আর কখনও ঘটে নাই। কাত্যায়ণী হঠাৎ একখানা চ্যালা কাঠ তুলিয়া লইয়া

অকিঞ্চনের দিকে ধাবিতা হইলেন, বলিতে লাগিলেন,—দূর হয়ে যা, বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে—দেখ্‌ব না তোর মুখ…

অকিঞ্চন বলিল,—বয়েই গেল। বলিয়া সাধের শ্নো হাতে করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর।

কাত্যায়ণী হাতের কাঠ ফেলিয়া দিয়া স্বামীর কাছে ছুটিয়া গেলেন; স্বামীর পায়ের কাছে ঠাস্‌ হইয়া পড়িলেন; কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন,—ছেলে আমাদের নাই, নাই, নাই। ভগবানের দিব্যি করে বল্‌ছি, আমাদের ছেলে নাই।

জগবন্ধু কথা কহিল না।

কাত্যায়ণী বলিতে লাগিলেন যে, নারী হইয়া জন্মগ্রহণই তাঁর অদৃষ্টের কঠিনতম দুঃখ এবং যত বিড়ম্বনার কারণ।

রাস্তায় কতজনের সঙ্গে অকিঞ্চনের সাক্ষাৎ হইল—অকিঞ্চন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে তাহা অনেকেই জানিত।

একজন ডাকিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি হে, বৌ এল?

অকিঞ্চন বলিল,—না, আসেনি।…

বাবাকে বোধ হয় ঠেঙিয়ে বিদেয় করেছে। বাবা আর মাকে খুব মা'র—মুখের ভাব দেখে বাড়ী থেকে পালিয়ে এলাম।

—তোর জন্যে তাঁদের খুব অপমানিত হ'তে হ'চ্ছে। তুই বড় অমানুষ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভারি বাহাদুর। বলিয়া অকিঞ্চন কোথায় গেল তার ঠিক নাই।

অকিঞ্চনের বন্ধু অনেক—তাহাদের মধ্যে সন্তোষ তাহাকে ডাকিয়া খাওয়াইল; কিন্তু তার বাবা আর মায়ের অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া সেদিনের দ্বিপ্রহরটা অনাহারে কাটিল।

বলা বাহুল্য, জগবন্ধুর মর্ম্মবেদনার কথা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। বধূ আসে নাই, জগবন্ধুর এই দুঃখে সহানুভূতি জ্ঞাপন প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য; ইহা অনেকেই উপলব্ধি করিলেন—

এবং বৈকালের দিকে দেখা দিলেন।

কাহারও ঘরে আগুন লাগিলে লোকে দড়ি বালতি ঘড়া কলসী লইয়া দৌড়াইয়া আসে—কেহ মইও আনে—কেহ আবার কাঁথা ভিজাইয়াও আনে; কিন্তু জগবন্ধুর এই বিপদে কাহারও দৌড়াদৌড়ি নাই—

নিবারণের জন্য বা নির্ব্বাপণের উদ্দেশে মুখের কথার অতিরিক্ত কিছুরই প্রয়োজন হইবে না। তবু মুখের কথার মত অমূল্য বস্তু আর কি আছে। মানুষ পরস্পর মিত্র হয়, শত্রু হয়, ঐ মুখের কথাতেই—ঐ মুখের কথাতেই কুটুম্বিতা বজায় থাকে কিংবা ভাঙিয়া যায়; এমনও অনেক আছে, যাদের কাজ কেবল মুখে মুখে কথা বলাই।

প্রাণ কথায় পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া প্রতিবেশীরা জগবন্ধুর দেহ শীতল করিবার জন্য, এবং দরকার হইলে সৎপরামর্শ দিবার জন্য আসিলেন···কিন্তু অক্রূর দত্তে একটু ব্যতিক্রম ছিল।

জগবন্ধু কাহারও নিন্দা করিলেন না; তিনি কেবল আক্ষেপ করিলেন ইহাই বলিয়া যে, মানুষের ইয়ত্তা পাওয়া সত্যই কঠিন; এবং পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণেই তার অদৃষ্টের কঠিনতম দুঃখ, এবং যত বিড়ম্বনার কারণ। তিনি শীঘ্রই মারা যাইবেন।

শুনিয়া দু'জন একটু বিমর্ষ হাসি হাসিলেন; একজন বলিলেন, না, না।...আর একজন বলিলেন,—আশ্চর্য্য ব্যাপার।

অক্রূর দত্তও কর্ত্তব্যানুযায়ী জগবন্ধুকে সান্ত্বনা দিলেন; বলিলেন,—ব্যাপারটাকে অত কঠিন ভাবে গ্রহণ করার মানে হয় না।···তারপর কথার মোড় ঘুরাইয়া দিয়া বলিয়া বসিলেন,—তোমার উচিত ছিল এমন ঘরে মেয়ে দেখব যারা কিছু বোঝে না, অনুভব করে না। বলিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

নন্দকুমার সরকার বলিলেন,—তোমার অকিঞ্চন যেমনই হোক্, তাকে সবাই আমরা ভালবাসি। যৌবনে একটু উচ্ছৃঙ্খল অনেকেই

থাকে, কিন্তু তা নিয়ে এত গোলযোগ হইতে দেখিনি।…অকিঞ্চনকে একটু সাবধান করে দাও না কেন?

জগবন্ধু দুর্ব্বলকণ্ঠে বলিলেন,—দিয়েছি, কিন্তু শুনতে চায় না।

—শুনি, তোমাকেও না কি সে কুকথা বলে' অপমান করে?

জগবন্ধু বলিলেন,—তা করে কি! বলিয়া টাকে হাত দিলেন।

—তবে ত আর উপায়ই দেখিনে। বলিয়া অক্রূর দত্ত পুনরায় বলিলেন,—বউ আর আসবে না, আমি বুঝতে পারছি।…সমান ঘর মানে এ নয় যে, তোমার আর তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান আর আর্থিক অবস্থা বা জাত কৌলিন্য একই রকম—চরিত্রেরও প্রকর্ষগত সামঞ্জস্য থাকা চাই। তোমার ছেলে তোমাকে নামিয়ে এনেছে ঢের। তার সম্বন্ধে যা শুনি তার সিকিও যদি সত্য হয় তবে কোনো ভদ্র পরিবারের সঙ্গে তাঁর মারফৎ সম্পর্কস্থাপন দূরের কথা, তাকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করাই কঠিন।…বিয়ের কথাবার্ত্তার সময় আমি উপস্থিত থাকলে বাধা দিতাম।

শুনিয়া কথাগুলি জগবন্ধুর বড় কঠিন মনে হইল। কথাগুলি দরদের নয়, কিন্তু সত্যে উজ্জ্বল—জগবন্ধুর সহ্য হইল না; তিনি কাতরোক্তি করিলেন; বলিলেন,—আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না।

—তবে ছেলেকে ত্যাগ করো, আর বৌয়ের আশা ত্যাগ করো। বৈবাহিকের গৃহে তোমার অপমান হয়েছে যদি মনে হয়ে থাকে তবে তার জন্যে দায়ী করো তুমি নিজেকে। বলিয়া অক্রূর দত্ত উঠিলেন…

জগবন্ধু দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—আবার বিয়ে দেব ছেলের।

—আমরা দিতে দেব না।—বলিয়া অক্রূর দত্ত যেন একটা সঙ্কল্প লইয়া আবার বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—খবদার, অমন কাজ করো না। মেয়েটির বাপ নেহাৎ মৃদুস্বভাব ভদ্রলোক বলেই ধরে' মারেনি'। যদি আরও অপদস্থ হতে না চাও তবে ও ইচ্ছা ত্যাগ করো। আমরাই তোমার ছেলের আবার বিয়ে ঘটতে দেব না। মানুষের জীবন পণ্ড করার ব্যবসা পত্তনের শত্রু তুমি এখানেই অনেক পাবে। বলিয়া অক্রূর দত্ত প্রস্থান করিলেন।—

এবং কিয়ৎক্ষণ পরে হুঁস করিয়া জগবন্ধু দেখিলেন, তিনি একা বসিয়া আছেন, এবং তাঁর মনে হইতেছে, অকিঞ্চন পুত্র নয়, পরম শত্রু।

ওদিকে অন্তঃপুরে হরিপ্রিয়া আসিয়াছেন।

হরিপ্রিয়া কিছু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন; সম্প্রতি প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন তবে দুর্ব্বলতা ঘুচে নাই; কিন্তু আজ তিনি নেশার জিনিষ পাইয়াছেন—তাহারই তেজে তাঁর শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমূহ এবং রক্ত-অস্থি-মাংস যথেষ্ট শক্তি অনুভব করিয়া কাজের জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। কাত্যায়নীর সঙ্গে দেখা করাই চাই।

কাত্যায়নীর সম্মুখে বসিয়া হরিপ্রিয়া তাঁর অসুখের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিলেন। অরুচিই ছিল অসুখের প্রধান উপসর্গ, এবং তাঁর প্রধান অশান্তি, তারপর কিরূপ মৃদুগতিতে অরুচি দূর

হইয়া আহারে রুচি ফিরিল তাহার যথাযথ বর্ণনা দিয়া বর্ণনার সমাপ্তিতে বলিলেন,—এখন ভাল আছি।

কাত্যায়ণী বলিলেন,—কবরেজ দেখ্‌ছিল বুঝি ?

জাত যাইবার ভয়ে হরিপ্রিয়া ডাক্তারী ঔষধ খান না, ইহা সবাই জানে।

হরিপ্রিয়া বলিলেন,—কব্‌রেজের কথা আর বলিস্‌নে কাতু! সে কি টিপে টিপে চিকিচ্ছে! আধখানা বড়ি, সিকিটে বড়ি—এম্‌নি করে তার চিকিচ্ছে। মিন্সে কিছুতেই বুঝবে না যে, আমি তাড়াতাড়ি উঠতে পারলে বাঁচি। ওষুধ যা মুখে দি তা জিবেয় লেগেই থাকে—পেটে তার এক ফোঁটা গেছে কিনা ভগবান জানেন।

কাত্যায়ণী বলিলেন,—যাক, সেরেছে ত' !

—নেহাৎ সারবে বলেই সেরেছে—ওষুদে সারেনি। অত টিপে চিকিচ্ছেয় রোগ সারে! মনে মনে রেগে আর বাঁচিনে।

শুনিয়া কাত্যায়ণী একটু তোষামোদের হাসি হাসিলেন।

তারপরই হরিপ্রিয়া বলিলেন,—তা ত' হ'ল। কিন্তু বৌ যে এল না, তার কি হবে ? বলিয়া অরুচির দরুণ দুর্ব্বলতায় নিষ্প্রভ চক্ষু দুটি তিনি পূর্ব্বোক্ত নেশার জোরে শাণিত করিয়া তুলিলেন, দেখিলেই মনে হইবে ক্ষমা তিনি কাউকে করেন না।

কাত্যায়ণী বলিলেন,—তার কথা ভাবাই আমরা ছেড়ে দিয়েছি। সে আমাদের নাগালের বাইরে।

—ছেলেও। বলিয়া হরিপ্রিয়া ভ্রূভঙ্গী করিলেন, এবং কাত্যায়ণ পাণ্ডুর হইয়া উঠিলেন। ছেলে তাঁদের নাগালের বাইরে—যে ইতিহাস

ঐ কথা ক'টির আঁশে আঁশে জড়াইয়া আছে তাহা ঠিক এই মুহূর্তটিতে কাত্যায়ণীর যেমন নির্দয় তেমনি অনন্ত মনে হইল। ছেলে তাঁদের বুকেই বাস করে, তাকে তাঁরা জানেন, তাহাকে স্মরণ করিয়া তাঁরা শোকাশ্রু মোচন করিয়াছেন, কিন্তু এমন করিয়া চারিদিক আঁধারে আচ্ছন্ন করিয়া সে কোনদিনই কষ্টদায়ক হইয়া ওঠে নাই। মাতৃহৃদয়কে সন্তান আচ্ছন্ন করিয়াই থাকে—সে স্বচ্ছ উজ্জ্বল অমৃতময় অনুভূতি—প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম দান, অনুভব করিতেই হইবে। কিন্তু এ যেন নিঃশ্বাসে বিষ উদ্গিরণে দৃষ্টি অন্ধ আর অন্তরের সমস্ত মুখরতা তন্ময়তা নিরোধ করিয়া দিয়া অসাড় অচল একটা অস্বাভাবিক জড়বস্তুর মত চাপিয়া আছে—চাপে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকে⋯

তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই।

কাত্যায়ণী কিছু বলিলেন না দেখিয়া হরিপ্রিয়া বলিলেন,—ছেলের আবার বিয়ের কথা আমি ভাবছিলাম, অসুখে শুয়ে শুয়েই। ঘর-সংসার করতে হ'বে, বংশটাও বজায় রাখ্‌তে হবে; কিন্তু শেষে ভেবে দেখ্‌লাম, ও-ছেলের বিয়ে দে'য়াই তোমাদের ভাল হয় নাই—আবার বিয়ে ত' দিতেই পারো না।

—তা' আমরা জানি। বলিয়া কাত্যায়ণী হরিপ্রিয়ার সত্যোদ্‌ঘাটন এবং অনুশাসন শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন⋯তারপর বলিলেন,—মানুষের যন্ত্রণার ওপর যন্ত্রনা দে'য়া মানুষের কাজ নয়। আমি ত' আগেই একদিন বলেছিলাম, ছেলেরই সব দোষ—তার বেশী দোষ তার বাপ্ মায়ের; বৌয়ের দোষ নাই—আমাদের সংসারে থাকার মত সামগ্রী সে নয়। বলিতে বলিতে কাত্যায়ণী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

হরিপ্রিয়া এতক্ষণ ক্রমান্বয়ে কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিতেছিলেন—কাত্যায়ণীর চোখে জল দেখিয়া তিনি নরম হইলেন ; বলিলেন,—কেঁদে দুঃখ করে' লাভ নেই, কাতু। তোদের দুঃখু দেখে আমারও মনে হয়, ছেলে না হওয়াই ভাল।

—সব ছেলেই কি সমান! অন্য কথা বলো—ছেলের কথা আমি ভুলে' থাকৃতে চাই।

কিন্তু অন্য কথা বিশেষ হইল না—

যে নেশার জোরে হরিপ্রিয়া এতদূর হাঁটিয়া আসিয়াছেন আর এত কথা কহিয়াছেন সে নেশা তার আর নাই—তিনি দুর্ব্বলতার আক্রমণ অনুভব করিয়া বলিলেন,—শরীর ভাল নেই, উঠি এখন।

রাধাবিনোদ এবং হেমশশীকে কিছুকাল ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতেই হইল। রাধাবিনোদ অল্পেই বিব্রত হইয়া পড়িল—জামাতা-বাবাজীর ক্রোধ দেখিয়া তিনি একদিন ভয়বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু এই ব্যাপারটার সমগ্রতা এমন প্রত্যক্ষ আর পরিসমাপ্তি এমন চূড়ান্ত যে, মনে মনে হায় হায় করিয়া তিনি কোন্‌দিকে ছুটিবেন তাহারই

দিশা না পাইয়া অটল হইয়া রহিলেন। রাধাবিনোদ বাধা পাইয়াছেন —তিনি সবল সামাজিক মানুষ; কন্যার সুপাত্রে বিবাহের কল্যাণে পারিবারিক সবলতাকে বর্দ্ধিষ্ণু, গতিশীল আর সঞ্জীবিত করিবেন, ইহাই ছিল তাঁর ধ্যান···কিন্তু বাধা পাইয়া তিনি স্বীকার কবিলেন যে, অদৃষ্টে যাহা লেখা আছে তাহা অনিবারণীয়···ইহা দাঙ্গা নহে যে, লোক আর লাঠি সংগ্রহ করিয়া একবার লড়িয়া দেখা যাইতে পারে; ইহা খাজানা বৃদ্ধির মামলা নহে যে, খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রমাণ করিতে পারিলেই জয় নিশ্চিত; ইহা রোগও নহে যে, উপবাস দিয়া এবং ডাক্তার ডাকিয়া একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে··· ইহা একেবারে চরম প্রাপ্তি—মৃত্যুর মত নিঃশেষ বিচ্ছিন্নতা। সুতরাং তিনি ভগবানের বিধানে বিশ্বাস করিয়া শান্তভাব ধারণ করিয়া রহিলেন।

"এ কি হ'ল?"—বলিয়া হেমশশী কাঁদিলেন, কিন্তু মেয়েকে লুকাইয়া।

তারপর উভয়ে পরামর্শ করিয়া দেখিলেন, মেয়ের উপর তাঁদের জোর নাই, কারণ সে স্বাভাবিক। জামাই চরিত্রহীন বলিয়া মেয়ে তাহার কাছে যাইবে না—ইহার চাইতে স্বাভাবিক এবং তর্কাতীত আর কি হইতে পারে!···তবে একটা কথা পুনঃ পুনঃই মনে হইতেছে যে, বিবাহের পূর্ব্বে বন্ধু-পুত্রটির চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয় নাই— ইহাতে তাঁদের কেবল দূরদর্শিতার অভাবই নয়, পারিবারিক সহজ বুদ্ধিরই শোচনীয় অভাব দেখা যাইতেছে।

এই কথাটাই টের পাইয়া কিশোরী একদিন কণ্টক উৎপাটন

করিতে গেল ; বলিল,—আমার শ্বশুরের যদি মেয়ে থাক্‌ত তবে তিনি মেয়ের বিয়ের সময় জামাইয়ের চরিত্রের খোঁজ নিতেন। তোমরা যে নাওনি সে তোমাদের বুদ্ধির অভাব নয়, ভদ্রতার জ্ঞান। ভদ্রঘরের ছেলে ভদ্র হ'বে। ইহার ব্যতিক্রম তোমরা ভদ্র বলেই সন্দেহ করনি।

শুনিয়া রাধাবিনোদ কথা কহেন নাই—তাঁর চক্ষু সজল হইয়া উঠিতে চাহিয়াছিল।

অক্রূর দত্তের জুড়ি এ-গ্রামেও অনেক আছেন দেখা গেল ; তাঁহারা সমস্বরে বলিলেন,—মেয়ে তোমার ঘরেই থাক্।...ছিঃ। ওরূপ অবস্থায় ছেলের বিয়ে দেওয়া ওঁদের অন্যায় হয়েছে।

একটি নিঃশ্বাস বহন করিয়া এদিক্‌টা যেন চুকিয়া গেল—প্রকাশ্যে আলোচনা আর হয় না।

কিশোরী ঠাণ্ডা চাপা মেয়ে—তার মনের গভীর কথাটি বুঝিবার উপায় নাই। তাহাকে তাহার সখীরা সাহস আর সান্ত্বনা দিয়াছে ইহাই বলিয়া যে, এমন অবস্থায় সে যাহা করিয়াছে তাহাই নারীর করণীয়।...বাহ্যতঃ প্রশান্তভাবে দিন চলিতে চলিতে দ্বিতীয় মাসের একটি দিনে কিশোরী অনুভব করিলে যে, সে গর্ভবতী। এ-দিক্‌টা

কেউ ভাবে নাই—কিশোরীও না।...তাহার এই অনুভূতিটা যে অচিন্তনীয় আর স্বতন্ত্র আকারে দেখা দিল তাহা চিরস্মরণীয়—সংসারের আর কোনও নারী জঠরে সন্তান আগমনের সংবাদ ঠিক এম্‌নি করিয়া গ্রহণ আর অনুভব করে নাই।...সংসারে যে শুভ সংযম দেখা যায় এবং বিবাহের যে দার্শনিকতা আজ পর্য্যন্ত মানুষকে মুগ্ধ এবং পবিত্র করিয়া আসিয়াছে তার উৎপত্তি না কি স্বামীর ঔরসে নারীর গর্ভধারণেই। নতুবা বিবাহের যে কদর্য্য অর্থ দাঁড়ায় তাহা সভ্যতা নহে।

কিন্তু সহজ সরল সকল অর্থ ঘুচিয়া গিয়া কিশোরী যে অর্থ পাইল তাহা ভয়ানক। এমন নিরর্থক অযাচিত ব্যাপার, একদিকে হাস্যকর, অন্যদিকে হৃদয়বিদারক হইয়া আর কাহারো জন্য কখনও ঘটে নাই বোধ হয়।...এই সন্তান কি স্বামীর আত্মজ? স্বামী যাহা অকাতরে দান করিয়া করিয়া ইহকাল ও পরকালব্যাপী কলুষ মর্ম্মে আত্মায় পুঞ্জীভূত করিয়াছিল, এই সন্তান সেই অশেষ কলুষজাত—ইহা শুভ নহে, সার্থক নহে, ইঙ্গিত নহে, ইহা অবাঞ্ছিত এবং বর্জ্জনীয় কলুষ। সর্পের যেমন বিষদাঁত থাকে, ঐ পুরুষটির অন্তরে তেমনি একটি জ্বালাময় প্রবৃত্তি আছে—এই সন্তান তার সেই প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির চিহ্ন মাত্র—বিবাহিতা পত্নীর গর্ভের সন্তানের যে মূল্য লোকে দিয়া থাকে ইহার সে মূল্য নাই—যে অনশ্বর অমৃত-বস্তুর আধার হিসাবে সন্তান নিত্য আর নিরঞ্জন সে বস্তুর স্বাদ সে ত' পায় নাই।...এই অনুভূতি একটি ক্ষণের আঘাত যন্ত্রণা নহে—দিনের পর দিন অনির্ব্বাণ ব্যাধি-যন্ত্রণার মত দীর্ঘকাল এই গর্ভ বহন করিয়া দুর্ব্বিষহ ক্লেশের ভিতর

দিয়া একদিন ক্লেশ চরমে উঠিয়া সন্তান বহনের অবসান হইবে—কিন্তু তার মুখ দেখিয়া কি সে সব যন্ত্রণা ভুলিতে পারিবে, যেমন সকল মা পারে? সে তা পারিবে না। সকলেই বোধ হয় তখন নিজেকেও বিস্মৃত হইয়া কেবল তাহাকেই চিন্তা করে যাহার প্রেম যেন স্বর্গ হইতে রূপায়িত হইয়া সন্তানের মূর্ত্তিতে কোলে আসিয়াছে। তাহার তা' নয়।

কিশোরী ছুটিয়া গিয়া হঠাৎ মায়ের কাছে দাঁড়াইল—

হেমশশী জিজ্ঞাসা করিলেন,—অমন করে' এসে দাঁড়ালি যে? বলিয়া মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন…

কিশোরী কথা বলিতে পারিল না—যে কাজের সার্থকতা নাই কিন্তু লজ্জা আছে, তাহার মত অব্যক্ত বেদনাপ্রদ আর কিছুই নয়। কিশোরী সেই বেদনায় নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল…

হেমশশী বলিলেন,—কি বল্‌তে চাস?

কিশোরী বলিল,—কিছুই বল্‌তে চাইনে, মা। বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল…বলিতে লাগিল,—আমি কিছুই চাইনে, মা, আমি কিছুই চাইনে।

—কি বল্‌ছিস তুই?

—বলি।…তোমরা আমায় কেটে ফেল্‌তে পারো, মা?

হেমশশীর মনে হইল, খামখা মাথা খারাপ করিয়া মেয়ে কি বলিতেছে তার ঠিক্ নাই; হাসিয়া বলিলেন,—না, তা পারি নে। মাথা খারাপ করিস্‌নে, মা।

—পার না? তবে আমি কি করব বল। আমার পেটে ছেলে

এসেছে।···তোমার পায়ের তলায় আমি পড়লাম—যা' খুশী করো তোমরা আমায় নিয়ে—আমি আর পারছি নে। বলিয়া কিশোরী মায়ের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

কর্ণধর পালের গমন ও আগমন

সাত-পুরুষের ভিটার মাটি এবং তার উপকার বাস্তু-গৃহ মানুষের যে কত প্রিয় তার ঠিক নাই—বোধ হয় প্রাণের চাইতেও প্রিয়; কাজেই উহাকে ত্যাগ করিয়া চিরদিনের মত অন্যত্র চলিয়া যাওয়া হৃদয়বিদারক ব্যাপার সন্দেহ নাই। কষ্টটা এমনি সত্য যে, সত্য কি না সন্দেহ করাই নির্ম্মমতা। কিন্তু পরস্পর শুনা গেল, এবং শুনিতে শুনিতে, এবং পরে উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া ক্রমশঃ সন্দেহই রহিল না যে, কর্ণধর পাল তাহাই করিতেছে। কর্ণধর পাল বর্ত্তমানে মৃত্যুশয্যায় শায়িত রহিয়াছে, অর্থাৎ অন্তরের মায়া দিয়া, আর যেন দেহের নাড়ী দিয়াও পাকে পাকে বাঁধা, এবং সহস্র স্মৃতিমণ্ডিত গৃহকে সে মৃত্যুর ডাকে ছাড়িয়া যাইতেছে তাহা নহে। ব্যাপার অন্যরূপ—স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে সে মাটিসহ বাড়ী বিক্রয় করিয়াছে। কাহার কাছে সে বিক্রয় করিয়াছে তাহা অবশ্য জানা গেল না, কিন্তু সে বিক্রয় করিয়াছে; এবং আরও জানা গেল যে, বাড়ীখানাকে সে বেচিয়া ত' দিয়াছেই, আরো বেচিয়া দিয়াছে তার অস্থাবর সম্পত্তি যাহা-কিছু ছিল সবই—এমন কি মজুত মাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ হাঁড়ী, কলসী, সরা, মালসা,

ঘট্, গাম্‌লা, কুঁজো, কল্‌কে, হোলা, ঠিলে ইত্যাদি—আর চক্রখানা, যাহা কাঠিতে করিয়া ঘুরাইয়া সে ঐ সব বস্তু প্রস্তুত করিত...

লোকে আরো শুনিল, এবং কেহ কেহ চোখেও দেখিল যে, কর্ণধর পাল বাঁধন ছিঁড়িবার কষ্টে চোখের জলে পুনঃ পুনঃ স্নান করিয়া উঠিতেছে।

কর্ণধর পাল অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি—

তবু ইহা না বলিয়া দিলেও চলে যে, কর্ণধর পাল ধিক্কারে আর লজ্জায় অভিভূত হইয়া এবং অশ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া ঐ অসহ্য কাণ্ড করিয়াছে, সহজে করে নাই। এ দেশে আর সে থাকিবে না, মুখ দেখাইবে না; অন্য দেশে চলিয়া যাইবে বলিয়া সে সঙ্কল্প করিয়াছে। সঙ্কল্প তার অটল বলিয়াই মনে হইল।

সন্তানাদি যার হয় নাই তার স্ত্রী-বিয়োগ যদি ঘটে তবে একা একা আর ভাল লাগে না বলিয়া বাড়ীতে কুলুপ লাগাইয়া আন্তরিক বৈরাগ্যসহ কিছুদিন তীর্থপর্য্যটনে নিরুদ্দেশ হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক—বিশেষতঃ মহাভারত যদি তার নিত্য-পাঠ্য হয়; কিন্তু সে ধরণের বিয়োগ-বেদনা কর্ণধর পালের সংসার-স্পৃহা বিলুপ্তির হেতু নহে—

কিম্বা ঋণের দায়, কিম্বা জমিদারের অত্যাচার তাহার কারণ নহে—

কারণটি বড়ই জটিল এবং আরো কঠিন।

কর্ণধর পালের বিধবা এবং অবশ্য যুবতী কন্যা—সুন্দরী রমণী—বৎসর দেড়েক হইল বিদেশী একটী যুবকের সঙ্গে পলায়ন করিয়াছে। তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই—পুণ্যক্ষেত্র নবদ্বীপে পাওয়া যায়

নাই, তীর্থ- শ্রেষ্ঠ কাশীধামে পাওয়া যায় না—রাজধানী কলিকাতায় পাওয়া যায় নাই। মেয়েটীর জন্য কর্ণধর ধনে প্রাণে গেল।

কর্ণধরের এখন ঐ একটি মাত্রই সন্তান, কন্যা। আগে ও পরে আরও দু'তিনটি সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহারা মনে দাগ কাটিয়া বসিবার পূর্ব্বেই, অর্থাৎ নাড়াচাড়ার সুখে এবং দেখিয়া দেখিয়া মমতা জন্মিয়া মনে চিরস্থায়ী হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই, পরলোকগমন করায় নগণ্য হইয়া গেছে—টিকিয়া গেছে ঐ কন্যা—সর্ব্বনাশী কন্যা। কন্যা সর্ব্বনাশ ঘটাইবার পূর্ব্বে সে-ই ছিল একমাত্র বন্ধন…

কিন্তু বন্ধন যে ও-তরফ হইতে এমন শিথিল হইয়া আসিতেছে তাহা কে জানিত! সামান্য কয়েকটী মাস—আট-দশ মাসের বেশী নয়—স্বামীগৃহে বাস করিবার পর কন্যাটি বিধবা হইয়া ফিরিয়া আসিল—সিঁদুর পরিয়া বাহির হইয়াছিল, সিঁদুর মুছিয়া ঢুকিল। সেই নিদারুণ প্রত্যাবর্ত্তনে কর্ণধর তার গভীরতম সম্বিতেও দুঃখিত হইয়াছিল কি না তাহা ঠিক করিয়া বলিতে সে নিজেই বোধ হয় পারে না। কারণ ঐ কন্যাই যে তার একমাত্র বন্ধন। বিধবা কন্যাকে একেবারে যৌবনে মাছ-মাংসে আর শাঁখা-সিঁদুরে বঞ্চিত হইয়া তপস্বিনীর বেশে অহরহ সম্মুখে দেখিয়া কর্ণধরের বুক ফাটিত, কি একমাত্র সন্তান অর্থাৎ সুখস্বপ্নের একমাত্র অবলম্বনকে ফিরিয়া পাইয়া সে স্বস্তি পাইয়াছিল তাহা লইয়া বাহিরে তর্ক করিবার উপায় নাই—তাহা কর্ণধরের পরমাত্মা জানে।

তারপর দিন যায়—

তারপর দিন একাদিক্রমে আরো গত হইতে হইতে মেয়ের শ্বশুর

বাড়ীর দেশেরই একটি ছেলে আসিয়া স্বর্গগত জামাতার আত্মীয় পরিচয়ে দিন দুই আদরে আপ্যায়নে থাকিবার পর, এবং বিস্তর সদাশয়তার পর, মেয়েটিকে লইয়া পলায়ন করিল; দরিদ্র, নিরীহ ধর্ম্মভীরু, দেবদ্বিজে ও বৈষ্ণবে ভক্তিমান্ কর্ণধরের মুখে চুণ কালি পড়িল; গ্রামে হৈ হৈ উঠিল—ধর্ম্ম গেল…

এবং আরো যাহা ঘটিল তাহার বর্ণনা দেওয়া বোধ হয়—

অপরাধ হয় কিনা তাহা পরের বিবেচ্য।

কর্ণধর পাল লোকটি খুবই ভাল, নিরতিশয় গ্রাম্য; দেখিতে বেশ ছিম্‌ছাম্—সামান্য গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া আর কোমরে কাপড় বাঁধিয়া সে কাঁচা এবং পোড়ান মৃৎপাত্রের স্তূপের ভিতরে এবং চাকার সম্মুখে বসিয়া থাকে; কিন্তু মনে হয়, কর্ণধর ধুইয়া মুছিয়া নিজেকে বেশ পরিপাটি করিয়া রাখিয়াছে, যেন কোনো ভদ্রস্থানে যাইবে।… চাকা তার হাতে ঘোরে খুব, আর তার হাতের গুণে মাটি যে আকার ধরে তা' নিখুঁৎ—

ইহা ছাড়াও তার মন্দিরায় বেশ মিঠে হাত—এবং এ ছাড়াও তার আর একটা গুণ, হাতেরই গুণ, অসামান্য এক লোভনীয় গুণ এই যে বড় মিষ্টি করিয়া সে তামাক সাজে…

ব্রাহ্মণের হুঁকা সে তিন-চারিটি রাখে; তিন-চারিজন ব্রাহ্মণের একসঙ্গে পদার্পণ হইলেও তিন-চারিজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গেই সে নিযুক্ত রাখিতে পারে।

ইহা ব্যতীত কর্ণধরের মনটি সাদা, প্যাঁচ সে জানে না। অতএব গ্রামের সে প্রিয়পাত্র। তাহার, অর্থাৎ মৃদুস্বভাব সেবাপরায়ণ ভাল-

মানুষটির কন্যার অকাল বৈধব্যে তাহার অর্থাৎ বিধবা কন্যার পিতার বুকের বেদনার অনুকম্পন সেদিন গ্রামের বুকে বিদ্যুৎগতিতে ছড়াইয়া গিয়াছিল। যে মানুষটি বাঁচিয়া থাকিলে বিবাহিতা নারীর ভঙ্গুর দেহ হইতে অমর আত্মা পর্য্যন্ত চমৎকার রসসামগ্রীর অক্ষয় জোগান পাইতে থাকে তাহার, এককথায় স্বামীর মৃত্যুতে কন্যার ছটফটানি দেখিয়া শোকাহত কর্ণধরও মাটিতে, তার চাকার ধারে, উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল···

কর্ণধরের হিতৈষীগণ, দরদীবর্গ এবং অনুরাগী সবাই, যুবা বৃদ্ধ দুই রকমই কর্ণধরকে মাটির উপর হইতে টানিয়া তুলিতে দৌড়িয়া আসিয়াছিল···এবং সেই অবসরে অনেকরই, যুবা বৃদ্ধ দুই রকমেরই, চোখে পড়িয়াছিল যে-কর্ণধরের কন্যা দেবী দাসী অপরূপ রূপপ্রাচুর্য্য এবং যৌবনোদ্দামতা সঞ্চয় করিয়াছে।

তারপর সূর্য্যের উদয়াস্তের নিয়মে ঘটনায় ঘটনায় সময়ের ব্যবধানের বৃদ্ধি এবং শোকের ক্ষয় হইতে হইতে দেবী দাসী কান্নাটা ভুলিয়া কেবল দু'চারি গ্রাস সুখহীন নিরামিষ ভাত লোকের কথায় মুখে সুরু করিয়াছে, এবং কর্ণধর তামাক সাজিয়া পূর্ব্ববৎ আন্তরিকতার সহিত ব্রাহ্মণ-সৎকার করিতে লাগিয়াছে এমন সময় একদিন সকালবেলা উঠিয়া দেবী দাসীকে ঘরে কিম্বা ঘরের বাহিরে গ্রামে কোথাও পাওয়া গেল না।

কর্ণধর লোকটি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির এবং অতিরিক্ত স্নেহপরায়ণ বলিয়া ছুটাছুটি করিল প্রয়োজনের বেশী এবং মানুষকে জিজ্ঞাসা করিল নির্ব্বিচারে, সেই কারণে কথাটা দু'চার মিনিটেই গ্রামময় জানাজানি হইয়া গেল···

লোকে ভীড় করিয়া আসিল—

ভীড়ের ভিতর চন্দ্রশেখর দত্ত (৫৫) বলিলেন, আমাদের দিনে এ-সব ছিল না ; জীবনে কখনো দেখি নাই। বলিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী ভূপতিভূষণ রায়কে লুকাইয়া একটি নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

সকলেই সেই কথাই বলিল,—অননুমোদনের কথা…

যুবা বৃদ্ধ, দুই রকমের লোকই, সমস্বরে বলিল, ভারি কলঙ্কের কথা ইহা, যারপর-নাই ঘৃণ্য কথা, একেবারে হুঙ্কারজনক ব্যাপার…

শুনিয়া কর্ণধর পাল মাটির ভিতর হইতে আরো মুখ তুলিতে পারিল না।

তখন তাহাকে সকলে মিলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ; অগ্রণী যুধিষ্ঠির গোস্বামী বলিলেন—তোর অপরাধ ত' কিছু নাই, কর্ণ ; তোকে আমরা দোষ্ ছি নে ; তোকে আমরা এখনো শ্রদ্ধা করি, ধার্ম্মিক আর বুদ্ধিমান বলে ; কিন্তু এ-কথাও সত্যি যে, তোর একটা দায়িত্ব ছিল ; সাবধান হওয়া তোর উচিত ছিল।

ত্রিপুরেশ্বর চক্রবর্ত্তী (৫৭) বলিলেন—অজ্ঞাত কুলশীলস্য বাস দেয়ঃ ন কস্যচিৎ...

শুনিয়া কথাগুলিকে ব্রাহ্মণের অভিসম্পাৎ মনে করিয়া কর্ণধর মাটির ভিতর হইতে মুখ তুলিল ; এবং ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া দর্শকগণের পায়ের উপর সর্ব্বাঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া লুটাইতে লাগিল…

তখন তাহার অর্থাৎ কুলত্যাগিনী কন্যার পিতার, মর্ম্মবেদনার অনুকম্পন তাঁহাদের বুকেও প্রবাহিত হইতে লাগিল…

যুধিষ্ঠির গোস্বামী কৃপাবশতঃ, এবং শুশ্রূষার ভঙ্গীতে, তাহাকে তুলিয়া বসাইলেন।

কিন্তু বিশেষ কিছু করিবার নাই, বিশেষ কিছু বলিবারও নাই; ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চতর জাত্যন্তর্গত ব্যক্তিগণ কুম্ভকারকে সামাজিকভাবে সুতরাং অক্ষুরস্ত করিয়া, কি বলিবেন!

সকলে চলিয়া আসিলেন—

বৃদ্ধেরা আসিয়া বসিলেন উপেন সান্যালের বৈঠকখানায়, যুবকেরা গিয়া উঠিল শ্রীশ অধিকারীর দোকানে—

মেয়েরাও অবশ্য ব্যাপারটা শুনিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কাহারও বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন না, নিজের নিজের ঘরেই চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন।

কিন্তু পুরুষের স্নায়ু শক্ত বেশী, শীঘ্র চমকায় না, আর গাল দেওয়া ছাড়া তাঁরা আরো অনেক জানেন; সুতরাং তাঁহারা শাস্ত্র-প্রণেতা ঋষি হইতে বিদ্যাসাগর পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে যদি আধুনিকতম কথা-সাহিত্যের গতিতে অবতরণ করিলেন...

বিস্তর বকিয়া তারপর এক সময় তাঁরা নিঃশব্দ হইয়া গেলেন...

কি একটা অশান্ত অভাববোধ আর তৃষ্ণার দাহ সবারই প্রাণে মূর্চ্ছিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল তাহা তাঁহারা বোধ হয় জানিতেন না; কিন্তু এই সূত্রে তাহারই পীবর অথচ খিন্ন একটা চেতনা যেন অনুভব করিতে লাগিলেন...যাহার দরুণ ক্রমে সকলেরই মনে হইল উহাদের ভালবাসার কথাটা, সকলেরই মনে হইল, উহাদের ভালবাসা নিশ্চয়ই খুব গভীর; অপরাধ করিয়াছে বটে; অপরাধ অমার্জ্জনীয় বটে, কিন্তু কত ভালবাসে!

বৃদ্ধের দলের পীতাম্বর কবিরাজ (৫১) চুপ করিয়া থাকিতে থাকিতে বলিয়া উঠিলেন,—পরিণামে কষ্ট পাবে।

এদিকে যুবাদের দলের সূর্য্য কুশারী বলিল—এ আকর্ষণ নিরোধ করা অসম্ভব।

কথাটা যুবকেরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল, স্বীকার না করিয়া তাদের উপায়ই নাই; কারণ "পঙ্কের পথে"র কবি সূর্য্য কুশারী চুল অকারণে বড় রাখিয়া কেবল কবি সাজিয়া বসিয়া নাই—"বাজারে" যথার্থই তার কবি খ্যাতি আছে; সে নিজে অবশ্য উদ্বাহু হইয়া জানায় নাই, তবু ধরা পড়িয়া গেছে যে, মানুষের গভীরতম এবং আকুলতম আকাঙ্ক্ষার সন্ধান সে রাখে। কুশারী আবার বিদ্রোহী—সে বিদ্রোহ দূষণীয় কিছু নয়, সৃষ্টিশীল মনের আকুতি; সকলেই জানে, সে বিদ্রোহ চঞ্চল নয়, উদ্দীপ্ত নয়, অসহিষ্ণু নয়, পরন্তু পরিণত, সংযত, স্বল্পভাষ এবং গভীর। কুশারীর ভক্তেরা আরো স্বীকার করে যে, পরিপূর্ণতম বস্তুর প্রতি তার লোভ অসীম—নিজস্বকরণের লোভ নহে, বৈষ্ণব কবির মত সেই উদ্দেশে ধ্যানী হইয়া কাব্য রচনার লোভ।

সে যাহাই হউক, কুশারীর ধারণা ঐ—তাহা সে অবাধে অকপটে প্রকাশ করিল; এবং দেখা গেল, অথবা সঙ্গোপনে অন্তর্য্যামী জানিলেন, তাহার সঙ্গে মতভেদ কাহারও নাই···

ভালবাসা বাস্তবিকই দুর্লভ, অত্যন্ত দুর্লভ, আর সহজে প্রকট নয়; এবং এত লোভের জিনিষ যে, লোভ দমন করিতে না পারিয়া লোকে নাকাল হইয়া যাইতেছে। ভালবাসা পাইলে প্রত্যাখান করিবার কথা ভদ্রলোকেরা যতই ভাবুন, জীবন-দেবতা তাহাকে ঠেলিতে পারেন না।

ধ্বনির প্রতিধ্বনি জাগিবে না, অথবা বাতাস উঠিলে জলে ঢেউ উঠিবে না, ব্যবস্থা-প্রণয়ন দ্বারা যেমন তাহা ঘটান যায় না তেমনি তা' অনিবার্য্য।

মোটের উপর, লক্ষণ দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, দেবী দাসীর শ্বশুরবাড়ীর দেশের সেই লোকটা আসিয়া না পড়িলে, এবং তৎপূর্ব্বে ইহা জানিতে পারিলে যে, দেবী দাসী ভালবাসিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে তবে গ্রামেই কিছু ঘটিত।

বৃদ্ধেরা জিহ্বা এবং হস্তপদাদির সাহায্যে বিস্তর আস্ফালন করিলেন; ছেলেগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন, কারণ, "দেশের হাওয়া বিপরীত"...

উদ্দেশ্য সাধু, কথাও মূল্যবান—

কিন্তু মাঝখানে হঠাৎ একটা উল্টা কথা বলিয়া বসিলেন পুরুষোত্তম বাগ্‌চি (৬৩); তিনি বলিলেন,—আমাদের কিন্তু এস বলে' কেউ কোনোদিন ডাকে নাই। কেন কে জানে! থোর বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোর বলিয়া তিনি উঠিলেন।

পুরুষোত্তমের ঐ অসংযত ও অসঙ্গত উক্তি শুনিয়া উপস্থিত সকলে প্রথমে যেন মানে না বুঝিয়াই উচ্চ-হাস্য করিলেন; তারপর হুঁস্ হইল যে, কথাটা খারাপ; তখন সকলে তাঁহাকে ধিক্কার দিলেন।

কন্যাই গেল, সুতরাং বাড়ী দিয়া কি হইবে? গাভীর দুগ্ধ কে খাইবে? বাবা বলিয়া কে ডাকিবে? বলিবে, বাবা, চান্ করো,

বেলা ঢের হয়েছে। কেহ তাহা বলিবে না। তবে সংসারে আর রহিল কি? সে-ই বা রহিবে কাহার জন্য?

অতএব কর্ণধর পাল তল্পী বাঁধিল। কোথায় যাইতেছে বলিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানের কথা সে কাহাকেও বলিল না—তীর্থস্থান অতএব তাপিতের আশ্রয়, নবদ্বীপ কি কাশী কিম্বা প্রসিদ্ধ স্থান কলিকাতা—ইহার মধ্যে কোন্ স্থানে সে যাইতেছে তাহা জানা গেল না—

জিজ্ঞাসা করিলে বলিল—এ পোড়া মুখ যেখানে হোক্ গুঁজে' থাক্‌ব···গাছে হাঁড়ি টাঙাতে চল্‌লাম বলিয়া কাঁদিয়া ভাসাইল।

বিদায়কালে সে ব্রাহ্মণগণের পদধূলি লইল যত, চোখের জল ফেলিল তত; এবং চোখের জলে আর পায়ের ধূলায় মাখামাখি করিয়া এমন একটা করুণ-কঠিন হিতে বিপরীত কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল যে, সূর্য্য কুশারী সেই আব্‌হাওয়ার প্রভাবে পড়িয়া দুর্জ্জয় প্রেম-সংক্রান্ত একটি অশ্রু-করুণ কবিতা তখনই লিখিয়া আনিল··· নিজেই আবিষ্ট হইয়া নিরতিশয় মন্ত্র-মুগ্ধের মত লেখা বলিয়া ছেলেরা অনেকে তাহা মৃদুগুঞ্জনে আবৃত্তি না করিয়া ছাড়িল না।

ত্রিপুরেশ্বর চক্রবর্ত্তী তল্পী-ঘাড়ে কর্ণধরকে সান্ত্বনা দিতে দিতে গ্রামের বাহিরে রাস্তায় তুলিয়া দিয়া আসিলেন।

—

কর্ণধরের বাড়ী এখন পড়ো' বাড়ী—চাল বেড়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। কর্ণধর সুদূরে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া এই গৃহের কথা স্মরণ করিয়া বোধ

হয় নিঃশ্বাস ফেলিতেছে, আর নিংশ্বাসের সঙ্গে নীরব অশ্রুপাতও করিতেছে, কিন্তু গ্রামের লোক তাহাকে এই অল্প দিনেই ভুলিয়া গেছে।

মরমী সূর্য্য কুশারী কথাটা—কর্ণধরের কথা নয়, তার মেয়ের কথা—তুলিয়া মাঝে মাঝে মুক্তি-ধারার বন্দনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে তার নিজস্ব গতির ঝর্ণা, স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা আর দোলন ছন্দে··· ভাবময় পারিপার্শ্বিকে তার শব্দ-তরঙ্গ বাজিতে থাকে···মুক্তোর মত সমুজ্জ্বল শব্দ মালা বাহির হইতে থাকে...মর্ম্মরত ঘন নিঃশ্বাসে যবনিকা দুলিতে থাকে ···

নিজের এই ব্যাখ্যা সূর্য্য কুশারী আজকাল করে—

তা' ছাড়া সাধারণ লোকের কর্ণধরের কথা মনে নাই, এমন সময় দেখা গেল, কর্ণধরের সেই 'পড়ো' বাড়ীর সম্মুখে ইট পড়িতেছে; একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক মজুরের উপর কর্ত্তৃত্ব আর কাজের বিলি-ব্যবস্থা করিতেছেন···

চিন্তামণি ভিষক্‌রত্নের প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোকটি পরিচয় দিলেন যে তিনি মহাদেবগঞ্জের জমিদার শ্রীযুত সমরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী মহাশয়ের কর্ম্মচারী; এই বাড়ী তিনি—সমরেন্দ্রনারায়ণ—প্রস্তুত করাইতেছেন; ইট তাঁরই।

মহাদেবগঞ্জ কোন্ জিলার অন্তর্গত?

সমরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরীর কর্ম্মচারী জানাইলেন যে, মহাদেবগঞ্জ রাজসাহী জিলার পুরন্দরপুর পুলিস ষ্টেশনের অধীন একটি বিশেষ স্থান। যে প্রাচীন জমিদারবংশ রাজসাহী জিলাকেই অলঙ্কৃত করিতেছে তাহা ঐ মহাদেবগঞ্জেরই; জমিদারবাবু সিংহ চৌধুরী

উপাধিক। মহাদেবগঞ্জেই তাঁহাদের সদর কাছারী। যে মহাদেবগঞ্জ কাঁচাগোল্লার জন্য বিখ্যাত সে ঐ মহাদেবগঞ্জই।…সমরেন্দ্রবাবু এই বাড়ী ক্রয় করিয়াছেন; এক্ষণে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করাইবেন।

ঐ কথায় গ্রামে একটা আন্দোলন সুরু হওয়া বিচিত্র নয়। কোথায় জিলা রাজসাহী, আর তার ভিতর কোথায় সেই পুরন্দরপুর পুলিস ষ্টেশনের অধীন মহাদেবগঞ্জ। ওরা আছে বলিয়া স্বপ্নেও কেউ জানে না।

তারিণীশঙ্কর গুপ্ত (৪৯) যতদূর সম্ভব অনুমান করিয়াও কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না…তারিণীশঙ্কর হাল ছাড়িয়া দিতেই সবাই শিথিল হইয়া গেলেন [illegible] পাল কর্ত্তৃক বাড়ী বিক্রয়ের ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল [illegible] দাঁড়াইয়া গেল…

তারিণীশঙ্কর তারপরও আরো খানিক্ ভাবিয়া শেষ পর্য্যন্ত ইহাই সন্দেহ করিলেন যে, কয়েক হাত ঘুরিয়া যদি মহাদেবগঞ্জের জমিদারের হাতে পড়িয়া থাকে:

তাহাই সম্ভব—

কিন্তু কর্ণধর কিছুই প্রকাশ করে নাই কেন? যেন, গোপনে সে কাজটা করিয়াছে—কেন? এখানে সে খরিদ্দার খোঁজে নাই পীড়াপীড়ি করিয়া জানিতে চাহিলেও সে এড়াইয়া যাইত—কখনো কখনো হঠাৎ এমন কাশিতে সুরু করিত যে মনে হইত, তার দমবন্ধ হইয়া আসিতেছে…

ব্যাপার আশ্চর্য্য।

অভাবনীয় কল্পনাশক্তি এবং অপরিমেয় অন্তর্দৃষ্টিসহ সজল সুন্দর

অভিমানের মালিক হইয়াও সূর্য্য কুশারীও অভ্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না।

জমিদারের কর্ম্মচারী, আশুবাবু, লোকটি অত্যন্ত অমায়িক; লোকের অকারণ ঔৎসুক্যে বিরক্ত না হইয়া জানাইলেন যে, এই বাড়ী প্রস্তুত করাইবার ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছে; ইহা ছাড়া উদ্বেগনিবারক আর কিছু তিনি অবগত নন্; ক্রয়-বিক্রয় তাঁর অসাক্ষাতে কোথায় ঘটিয়াছিল জানেন না। পথের লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াই তিনি এই দূরবর্ত্তী গ্রামের এবং পণ্ডিত বাড়ীর সন্ধান পাইয়াছেন।

ইহাতেও হতাশ না হইয়া তারিণীশঙ্কর প্রমুখ কয়েকজন কয়েক-দিন ধরিয়াই আরো চেষ্টা করিতে লাগিলেন...এবং সেই অবসরে আরও ইট আসিল...মাটি খুঁড়িয়া ভিত্তি প্রস্তুত হইল—

ইষ্টকালয় উঠিতে লাগিল...

তাহার সহিত আরো যাহা উপরের দিকে উঠিতে লাগিল তাহা হইতেছে গ্রামের লোকের চোখ; এবং সেই উদ্ঘাটিত চোখের সম্মুখে দিন দিন বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া উঠিতে লাগিলেন খ্যাতনামা মহাদেবগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার সমরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী...

বাসব বোস্ হঠাৎ একদিন বলিল,—শুন্‌ছি, লোকটা কোটীপতি।

ক্ষুদিরাম পাঠক বলিলেন,—হুঁঃ! কোটীপতি!

কিন্তু বাসব বোস্ পিছাইল না, সে কলিকাতায় চাকরী করে; বলিল,—ইন্টার প্রভিন্‌শ্যাল ব্যাঙ্কের ছোট ম্যানেজার বল্‌লে তাই।

ছ'টা যে রেসের ঘোড়া তার আছে তারই দাম দেড় লাখ্ ক'রে আঠার লাখ্।

—দেড় লাখ্ একটার দাম হ'লে ছ'টার দাম হয় বুঝি আঠার লাখ্! পণ্ডিত! তিনি কোটীপতি ঐ হিসেবে নাকি?

আর যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল সবাই হাসিয়া উঠিল···

কিন্তু সে হাসিতে পথ আট্‌কাইল না—কথাটা চলিতে চলিতে "লোকটা" প্রায় কোটিপতিতেই দাঁড়াইয়া গেল!

শুনিয়া সূর্য্য কুশারী পুলকিত হইল; লোকটা সুশিক্ষিত নিশ্চয়ই; কবিতাও নিশ্চয়ই বোঝে; গ্রামে বাস করিয়া সুখ পাওয়া যাইবে।

কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যে কোথা হইতে শুনিয়া আসিলেন, লোকটা নাকি খুবই দানশীল। তার দানের হাত বন্ধ করিতে একজন জবরদস্ত সাহেব ম্যানেজার রাখিতে হইয়াছে।

রাইরমণ গুহ জানিতে চাহিলেন—কে রেখেছে?

—সেই বাবুর মা। আবার কে?

—সায়েব ত' এখানেও আস্‌বে!

হরিপদ সান্ন্যাল বলিলেন—না-ও আসতে পারে, আবার আস্‌তেও পারে;

যে সাহেবকে বাবুর দানের হাত বন্ধ করিতে নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই সাহেব বাবুর দানের হাত বন্ধ রাখিতে এখানেও আসিতে পারে শুনিয়া কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যে দোটানার মধ্যে পড়িয়া বিমনা হইয়া গেলেন।

মহিম মিশ্র বলিলেন,—খুব পর্দ্দানশীন পরিবার নিয়েই আস্‌বে। পাঁচিল ত' আকাশে পৌছল' গিয়ে!

সূর্য্য কুশারী সেখানে ছিল ; বলিল—হ্যাঁ, খুবই উঁচু হচ্ছে। বলিয়া মাঝখান হইতে সে খানিক নিরাশ হইয়া গেল।

বাড়ী প্রস্তুত নিরাপদে সমাপ্ত হইয়াছে। পর্দ্দাহীন অর্থাৎ বেপরোয়া বাড়ী এবং হিন্দুপরিবারের উপযোগী পর্দ্দা-নশীন অর্থাৎ চোখ-লুকান বাড়ী—এই দুই রকমের বাড়ীর মাঝামাঝি কায়দায় বাড়ী অতি চমৎকারই হইল···লোকে বুঝিল, বাবু স্বয়ং বিলাতি ধরণের, উদারচরিত ; কিন্তু অন্তঃপুরে যাঁরা বাস করেন তাঁরা দেশী ধাতের, আড়াল চাহেন। নীচের তলাটা দরাজ উন্মুক্ত ; উপরটা আব্রুতে অন্ধকার না হইলেও এমন কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, বাহির হইতে কিছুই লক্ষ্য করিবার উপায় নাই। সূর্য্য কুশারী সেই দিকে তাকাইয়া চুপ হইয়া গেল··।

যাহা হউক, বাড়ী শেষ হইল—

দরজায়, জানালায়, কড়ি-বর্গায়, রঙে, বার্ণিশে, ঘুলঘুলিতে সার্শিতে, চৌবাচ্চায়, ইঁদারায়, হেঁসেলে, গোসলখানায় তাহা দেখিতে হইল যেমন মনোরম, তাহাতে বাসের সুবিধা হইলও তেমনি···

তারিণীশঙ্কর গুপ্ত ভিতরটা দেখিয়া আসিয়া বলিলেন,—বৈজ্ঞানিক বাড়ী হয়েছে। যেমন প্রচুর স্থান, তেমনি সজ্জা।

কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যে বলিলেন,—টাকায় সব হয়। বুদ্ধি খোলে আগে।

তারপর আসিল খাট, প্যালঙ্ক, গদি, বালিশ, আয়না, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি—সবই নূতন, সবই সুদৃশ্য, সবই মার্জ্জিত।

তারপর দেখা গেল সুবৃহৎ একটা টেবিল হারমোনিয়ামও আসিল এবং দ্বিতলে উঠিয়া গেল।

তারিণীশঙ্কর গুপ্ত বলিলেন—ধনী পরিবারের মধ্যে নাচ-গানের খুব প্রচলন হয়েছে। এঁরাও গানটান গাইবেন।

শিবকুমার আচার্য্য বলিলেন—নাচের কথা বল্‌লে—নাচেরও?

—তা' হয়েছে বৈ কি।

—তোমার সব আজ্‌গুবি কথা; যত মিথ্যে খবর পাওয়া যাবে তোমার কাছে। ঘুঙুর পায়ে দেয়?

—ত' জানি নে।

—ওদিকে মানুষ আকাশে উড়ছে, এদিকে নাচ্‌ছে গাইছে ভদ্র-লোকের মেয়েরা···আমাদের তা' হ'লে বায়ু মৃত্তিকা দুই পথই বন্ধ?

—হাঁ; অত না হোক্, চোখ কান বন্ধ করে' দরজা বন্ধ করে' থাক্‌তে হবে।

ওঁরা কুদৃশ্য দেখিবার ও অশ্রাব্য শুনিবার সম্ভাবনায় চোখ কান আগে-ভাগে বন্ধ করেন নাই; সুতরাং একদিন প্রাতঃকালেই দেখিতে

পাইলেন, সেই নূতন বাড়ীটার দরজার তালা খুলিয়া কাহারা যেন তাহার ভিতর প্রবেশ ক রয়াছে—

আরও টের পাইলেন, সেখানে শব্দজাত সজীবতার অন্ত নাই।

যাহারা আসিয়াছে এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে সেই মানুষ-গুলিকে তখনই চোখে দেখা গেল না, কিন্তু মানুষগুলির নমুনাস্বরূপ যাহাকে বাহিরে, ভিতরে প্রবেশের ফটকের ধারে, দেখা গেল, এৎমাম-পুর অবাক্ হইয়া গেল সর্ব্বপ্রথম তাহাকে দেখিয়াই···

কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যের কোটীপতি বাবুটির সঙ্গে দেখা করিবার আন্তরিক ইচ্ছা, প্রয়োজনই ছিল—কিন্তু এই খোট্টা দ্বারবানকে দ্বারে দেখিয়াই কাশীশ্বরের মনে হইল, বাবু দুর্গম দুর্গে বাস করিতে আসিয়া-ছেন। এই প্রহরীকে ঠেলিয়া বাবুর কাছাকাছি যাওয়া ত' দূরের কথা, ইহারই কাছে ঘেঁষা দুষ্কর···এই পর্ব্বতকে মুখের কথায় বা গায়ের জোরে টলান' এৎমামপুরের কর্ম্ম নয়।

বাস্তবিকই, অতবড় মানুষ অনেকেই দেখে নাই—অতখানি লম্বা, আর অতখানি চওড়া, অতখানি ছাতি, আর অতখানি গর্দ্দান! হাঁটু দু'টাই হাতীর দু'টা মাথার মত...আকারে আওয়াজে সে এক তাণ্ডব-তুফান ব্যাপার!

কাশীশ্বর চম্‌কিয়া উঠিলেন; তারপর রটাইয়া দিলেন যে, মহাদেব-গঞ্জের কাঁচাগোল্লা বিখ্যাত হউক আর না হউক, জমিদার যে প্রবল-প্রতাপান্বিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—যার আছে সে নির্ব্বোধ; সে গিয়া দেখিয়া আসুক ঐ লোকটাকে...ঐরাবতের মত প্রকাণ্ড, আর বিক্রমে সিংহ ঐ লোকটাকে—

জমিদারবাবু প্রবেশদ্বারে গিরি গোবর্দ্ধন রাখিয়া দিয়াছেন—নড়ায় কার সাধ্য !

শুনিয়া তামাসা দেখিতে লোক ছুটিল ; সেদিকে স্পষ্ট কেহ তাকাইল না, গোবেচারীর মত আড়চোখে তাহাকে দেখিল···ভিতরের ব্যস্ততার একটু আভাস পাইল, এবং দোতালার ঘরে মানুষের কণ্ঠস্বর অল্পস্বল্প শুনিতে পাইল···অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত সেই স্থানটা অতিক্রম করিতে হইল বলিয়া দোতালার ঘরের কণ্ঠস্বরে স্ত্রীকণ্ঠ মিশ্রিত ছিল কিনা তাহা নিঃসংশয়ে ধরা গেল না।

সূর্য্য কুশারী কবিতা কাঁদিতেছিল ; সে সূক্ষ্ম-দ্রষ্টা এবং ততোধিক সূক্ষ্ম-স্রষ্টা—উর্ব্বশীর পরিপূর্ণ সমগ্র তনুর চাইতে অদৃশ্য চরণের নূপুর-নিক্কণ শুনা যাইতেছে এই কল্পনা তার ভাল লাগে...

অন্তঃপুরের একেবারে সম্মুখে ঐ সুবৃহৎ রূঢ়তা দেখিয়া তার কবিতার শেষার্দ্ধ মাটি এবং কলালক্ষ্মীর অনবদ্য প্রাতঃ-চেতনাই বৃথা হইয়া গেল··· কর্কশ স্থূল আবরণ উপরে থাকে বলিয়া কুশারী-কবি নারিকেল খাওয়া ত্যাগ করিয়াছে, ফুলের পাঁপড়িতে কবিতার বই ছাপান যায় কিনা তাহাই সে চিন্তা করে···সুতরাং অন্তঃপুরের সম্মুখে দ্বারোয়ান রাখায় বিদ্রোহ ত' সে করিবেই—এ কি গদ্যের অরাজক যুগ না কি ? না, এটা পুরাণো, পচা, ভাপ্‌সা, নেহাৎ অন্যায়, হাবসী-হারেমের যুগ ? ভাবে রূপে এই দ্বন্দ্ব এখনো কি সহ্য করে লোকে ? জমিদারবাবু মনে করিয়াছেন কি !

সূর্য্য কুশারী মনে মনে গর্জ্জন করিতে লাগিল—

এবং গুণাকর দে দ্বারোয়ানের নাম রাখিল গিরিরাজ।

গতিহারা জাহ্নবী

গোধূলির প্রফুল্ল-লগ্নে সমরেন্দ্রনারায়ণ বহির্ভ্রমণে নির্গত হইলেন—সমগ্র এৎমামপুর সেই কোটিপতির দর্শন পাইল…

কিন্তু শিবের সঙ্গে ভূতের মত বাবুর সঙ্গে সেই দুরতিক্রম্য 'গিরিরাজ,' হাতে তার পাঁচ হাত লম্বা বাঁশের লাঠি—তেল মুছিয়া কাঁধে ফেলিয়াছে, আর লগ্নের সঙ্গে ও প্রভুর সঙ্গে একেবারেই—কবিতার গদ্যাত্মক পদের মত আর ফাল্গুনের মেঘের মত—একেবারেই বেখাপ্পা হইয়া সে পশ্চাতে চলিয়াছে…

সবাই দেখিল, বাবুর শরীর ভদ্রলোকের মত দোহারা, বর্ণ উজ্জ্বল ; পোষাকে অলৌকিক সমারোহ কিছুই নাই ; বয়স আটত্রিশ হইবে—তারিণীশঙ্কর ঐরূপ অনুমান করিলেন…বাবু নিজে বিন্দুমাত্র ভয়ঙ্কর নন্, কিন্তু তাঁর পশ্চাতের ঐ দানবটা যেন প্রচণ্ড একটা ধমক্।

সমরেন্দ্রনারায়ণ যখন বাড়ীর বাহিরে রাস্তায় নামিয়াছেন তখন পল্লীবাসিগণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়াই বাঞ্ছনীয় না হোক্ অনিবার্য্য বটে। সমরেন্দ্রনারায়ণ নিঃশব্দে আর গম্ভীরভাবে পথ চলিতেছেন… আপামর লোকে চিনিল, ইনিই তিনি যিনি ঐ অট্টালিকার মালিক, মানুষের দুষ্‌মন ঐ দ্বারবানের প্রভু, আর মহাদেবগঞ্জ তথা রাজসাহী জিলার অলঙ্কার, যাঁর মাতাঠাকুরাণী ছেলের সাহেব অভিভাবক রাখিয়াছেন, এবং যাঁর মনটি টাকা দান করিয়া করিয়া ফকির হইবার দিকেই প্রাণপণে ঝুঁকিয়া আছে, কিন্তু সাহেব হাত ধরিয়া আছে বলিয়া ফকির হওয়া ঘটিতেছে না।

"বাড়ীতে খবর দে গে"—বলিয়া পুরুষেরা ছেলেমেয়ের দ্বারা

ভিতরে খবর পাঠাইলেন—মেয়েরা জানালা বা দরজা একটুখানি ফাঁক করিয়া তাঁহাকে দেখিলেন…

কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যের অভিসারিকা প্রাণ-তৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল…

শত হস্ত দূর হইতে সূর্য্য কুশারী দুই হস্তের আঙুলগুলি মাত্র ভারতীয় পদ্ধতিতে যুক্ত করিয়া অতি সুকুমার এবং অতি পরিচ্ছন্ন একটি নমস্কার-নিবেদন করিল; কিন্তু কোনোদিকেই দৃষ্টি নাই বলিয়া সমরেন্দ্রের তাহা চোখে পড়িল না।

তারিণীশঙ্কর গুপ্ত অনুমান করিলেন যে, বাবুর বুদ্ধি চপল নয়।

নদীর ধারে ফাঁকা হাওয়ায় খানিক্ ভ্রমণ করিয়া সমরেন্দ্র গৃহে ফিরিলেন—পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দে এবং গম্ভীরভাবে এবং শালপাংশু বর্ব্বরটাকে সঙ্গে লইয়া।

কেহ তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে অগ্রসর হইলেন না; কিন্তু কাশীশ্বর প্রভৃতি সুজনবর্গ লক্ষ্য করিয়া রাখিলেন, ঐ নদীর ধারেই উঁহাকে ধরিতে হইবে।

সূর্য্য কুশারী কি অভিনব কল্পনা করিল কে জানে। তাহার দ্বিতীয় কবিতা গ্রন্থখানা "ধরণীর ধূলা"— যাহা আর্টিস্টিক শক্তিতে, প্রকাশের লীলায় এবং ব্যঞ্জনার বিশালতায় আরো সুন্দর হইয়াছে তাহাকে—প্রকাশকগণ ফেরৎ দেওয়া অবধি সে ব্যথিত হইয়া ছিল…হঠাৎ সে নিখুঁৎ করিয়া চুল বাগাইল, দাড়ি আঁচড়াইল। বৈদিক ঋষিগণের অনুকরণে সে চুল দাড়ি গোঁফ বাড়াইয়া তুলিয়াছে—এদিকে ঐ; ওদিকে সে লরেন্সের অত্যন্ত সমর্থ অনুরাগী; অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয়

সংস্কৃতির সঙ্গে য়ুরোপীয় আধুনিকতম চিন্তাধারার মিলন সে আকাঙ্ক্ষা করে···সমরেন্দ্রকে তাহা স্বীয় রূপে এবং বাক্যের ভাবে বুঝিতে দিতে হইবে।

সেটা পরের কথা ; আপাততঃ সেই দিনই সন্ধ্যার পর সূর্য্য কুশারীর একদিককার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল—সমরেন্দ্রের গৃহে অর্গ্যান-টিউন সুরযন্ত্রের সুরের সঙ্গে নারীকণ্ঠ মিশ্রিত হইয়া চির-সুন্দরের দিকে ধাবিত হইল···

সূর্য্য কুশারীর স্বতঃই মনে হইল, ঐ সুর যেন চঞ্চলপক্ষ চকোর—তৃষিত সে, আর সে অন্য কোনোখানের দিকে ছুটিয়াছে...

তার আরো মনে হইল, ঐ সুর একটা অশরীরী সৃষ্টি, একটা অতীন্দ্রিয় শক্তি, একটা অব্যক্ত অব্যাখ্যাত ইচ্ছা, একটা ক্লান্ত নিভৃত আত্মা···ঐ সুর কানে কানে শুনিবার জন্য সমস্ত আকাশ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করিয়া আছে ; এবং ঐ সুর শুনিতে শুনিতে নক্ষত্র সভার অশ্রান্ত হৃদয় কম্পন থামিতে চাহে না।

আরো আনন্দের কথা এই যে, সমরেন্দ্রের সঙ্গে কাশীশ্বর প্রভৃতির বাচনিক আলাপ না হইয়া গেল না—গিরিরাজকে ডিঙাইয়াই হইল।

নদীতীরে ওঁরা পূর্ব্ব হইতেই ওৎ পাতিয়াছিলেন—সমরেন্দ্র দেখা দিতেই অনেকখানি দূরত্ব রাখিয়া তাঁহারা জানাইলেন, বাবুর দর্শন পাইয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন ..

মুখের কথা ঐ সামান্য দু' চারিটি ; কিন্তু উনি যেন কিছুতেই অন্যায় মনে না করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে কথার সঙ্গে ভঙ্গীতে যে শ্রদ্ধা মিশাইলেন তাহা যেমন প্রচুর তেমনি মধুর।

সমরেন্দ্র উত্তরে জানাইলেন, এখানকার জলবায়ু ভালই বোধ হইতেছে।

শুনিয়া সকলেই বেশ সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন…

চিন্তামণির গায়ে তখনও জ্বর ছিল—তিনি বলিলেন—স্থানের স্বাস্থ্য ভাল।

তারিণী গুপ্ত কিছু অনুমান করিলেন না ; যা' অনুভব করিতেছেন বলিয়া তাঁর বিশ্বাস তাহাই প্রকাশ করিলেন ; বলিলেন—নদীর জল অতি সুপেয়, এবং অম্লনাশক।

শুনিয়া বাবু সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ; বলিলেন—তা' হ'লে ত' ভালই।

শিবকুমার আচার্য্য আকাশে ব্যোমযান এবং মৃত্তিকায় নাচগান এই দু'য়ের ভয়ে কোথায় দাঁড়াইবেন ভাবিয়া পান্ নাই…ঘুঙুর বাজাইয়া নাচ নয়, গলায় শুধু গান হইতেছে লোকের মুখে এই খবর পাইয়া তিনি নির্জ্জনে ভ্রূভঙ্গী করিয়াছিলেন…

তিনি বলিলেন—আহার্য্যও সুলভ।

সমরেন্দ্র বলিলেন—তবে ত' আরো ভাল।

পরস্পরের প্রতি সম্ভাষণ এবং প্রীতি জ্ঞাপন, সংবাদ দান আর সংবাদ গ্রহণ, সংক্ষেপেই শেষ হইল, তবু তাহা মূল্যবান। সবাই সুখী হইলেন।

বাবু গেলেন বাড়ীতে—

পরে এঁরা হইলেন বাড়ীমুখো—

আর যে যা-ই করুক, যা-ই ভাবুক, কাশীশ্বর উহাদের পশ্চাতে ফেলিয়া আপন বেগে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন—

বলিলেন—বাবুর সঙ্গে কথা কয়ে এলাম।

ব্রাহ্মণী বলিলেন—গলায় গেঁথে আনতে পারলে না বাবুকে, তাবিজ করে'? পেটে ভাত নেই, বাবু বাবু বাবু!

কিন্তু ঐ কথাগুলির কথা আরও বেশী করিয়া না বলিলেও চলে। সমরেন্দ্র ধনবান ব্যক্তি সন্দেহ নাই; আচারে আচরণে তিনি শ্রদ্ধাস্পদ, তাহাতেও সন্দেহ নাই, তাঁহাকেই পুরোভাগে রাখিয়া, অর্থাৎ তাঁহারই নামে ঐ অট্টালিকা নির্ম্মিত এবং সজ্জিত করা হইয়াছে ইহাও সত্য; কিন্তু তিনি যতই বৃহৎ হউন বৃহত্তর সত্তা থাকা কিছুই অসম্ভব নয়।

দু'দিন পরেই ঠিক্ দুপুর বেলা, গ্রামের লোক যখন খাইয়া-দাইয়া শুইয়াছে ঠিক্ তখন, নিতাইয়ের পিসী (৬৭) বাছুর খুঁজিতে বাহির হইয়া একটা বৃহত্তর সত্তারই সংবাদ লইয়া অকস্মাৎ বায়ুবেগে ছুটিতে সুরু করিয়া দিল…

সাম্‌নেই নবীন বটব্যালের বাড়ী—

নিতাইয়ের পিসী শশী বায়ুবেগে ছুটিতে ছুটিতে সেই বাড়ীতেই ঢুকিয়া পড়িল…

বটব্যাল-পত্নী উজ্জয়িনী দেবী তখন মেঝেয় পাটী বিছাইয়াছেন, আঁচল খুলিয়া পাটীর উপর ফেলিয়াছেন, শুইবেন; শুইবার আগে মেয়েকে বলিতেছেন, দেখে' আয় ত' কুকু, ওবেলাকার ডাল তরকারী

কি না? মুখ-পোড়াদের বেড়ালটা এসে এখুনি মুখ দেবে।···যা, দেখে আয়···

বলিতে বলিতেই, কথা শেষ না হইতেই, নিতাইয়ের পিসী শশী হুড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িল, আর হাঁপাইয়া আসিয়া পড়িল···

নিঃশ্বাস ফুরাইয়া আসিতেছিল—তবু সে বলিল—হেই-মাগো, এ কী দেখ্‌লাম পথে আস্‌তে! সে কথা, মা, বল্‌তে নারি।

তরকারী ঢাকিতে কুকু উঠিতেছিল—

উজ্জয়িনী কাৎ হইতেছিলেন—

দু'জনাই থামিয়া গেলেন। সেই অবর্ণনীয় ব্যাপার দেখিয়া শশী যে বিহ্বলতা লইয়া আসিয়াছে তাহাও অবর্ণনীয়; তাহাতেই উজ্জয়িনী চম্‌কিয়া উঠিলেন···তরকারী যে ঢাকা হইল না এবং তিনি যে শুইতে চান তাহাও ভুলিয়া গেলেন···

বলিলেন—মাগো, শুনে যে চম্‌কে উঠ্‌লাম। কি দেখলি শশী?

শশী বসিয়া পড়িল; বলিল—সে কথা মা বলতে নারি···

অনুচ্চারণীয় ভয়ের কথা ব্যক্ত করিতে গিয়া আরো ভয়ে তার চোখ আরো বিহ্বল হইয়া রহিল···বলিল—মাগো ঐ বাড়ীতে, ঐ যে বড় বাড়ী করেছে কোথাকার রাজারা, সেই বাড়ীতে—

—সে বাড়ীতে কি?

—সে-কথা, মা, বল্‌তে নারি।

—তবে এলি কেন ছুটতে ছুটতে ?

—বলি, বলি। ঐ বাড়ীতে রয়েছে আমাদের পিলে। বলিয়া শশী খালাস হইয়াও হাল্‌কা হইল না।

—পিলে ? পিলে কে ?

—ভুলে' গেলে এর মধ্যেই ! ঐ কর্ণ-পালের মেয়ে গো, যার নাম দেবীদাসী।

উজ্জয়িনী কথাটা উড়াইয়া দিলেন ; বলিলেন—ধ্যুৎ।

—হ্যাঁ, মা, হ্যাঁ পিলে। মিছে কথা যদি বলে' থাকি তবে যেন দু'টি চক্ষুর মাথা খাই। বলিয়া শশী চোখের দিকে আঙুল না তুলিয়া আঙুল তুলিয়া নিজের নাক দেখাইল।

উজ্জয়িনী বলিলেন—তোরা ত' চোখের মাথা খা'স কথায় কথায়। কোথায় দেখলি ?

—জান্‌লায় দাঁড়িয়ে ছিল, মা, পষ্ট দেখ্‌লাম। আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই ঝম্ করে' জান্‌লা বন্ধ করে' দিলে।

সাত-আট বছরের সময় দেবীদাসীর অসম্ভব প্লীহা বৃদ্ধি ঘটায় কে একজন বলিয়াছিল, "কর্ণধর, ওটা তোর মেয়ে নয়, ওটা তোর পিলে"। সেই অবধি পিলে বলিয়াই লোকে তাহাকে ডাকিত।

কিন্তু নিতাইয়ের পিসী ভুল দেখে নাই—সত্যই তা-ই। সমরেন্দ্র এই গ্রামেরই নিরুদ্দিষ্টা মেয়ে পিলেকে অর্থাৎ কর্ণধর পালের কন্যা দেবীদাসীকে ঐ বাড়ীতেই আনিয়াছেন, অথবা দেবীদাসীই আসিয়াছে ; অধিক কি, ঐ বাড়ীটাই দেবীদাসীর।

পথ ঘাট সম্পূর্ণ নির্জ্জন হইয়াছে মনে করিয়া দেবীদাসী ভরা দুপুরে

জানালাটা একটু খুলিয়া নিজের গ্রামের চেহারাখানা একটু দেখিয়া লইতেছিল…

কে জানিত যে, নিতাইয়ের পিসীর বাছুর হারাইবে দুপুর বেলাতেই, বাছুর খুঁজিতে সে এই পথেই আসিবে, আর তাহাকে দেখিয়া ফেলিবে, এবং চিনিয়া ফেলিয়া "ওমা" বলিয়া থমকিয়া দাঁড়াইবে!

ইহারও আগের কথা যা' তা' সবাই জানে, অর্থাৎ দেবীদাসী যে ব্যক্তির সঙ্গে পলায়ন করিয়াছিল সে দেবীদাসীকে দুধে ভাতে অর্থাৎ পরম সুখে রাখিতে রাখিতে পরিত্যাগ করিয়াছিল—পিস্তল দেখায় নাই বা লাথি মারে নাই, অমনি আর দেখা দেয় নাই…তারপর একটা নিষিদ্ধ গৃহ হইতে সমরেন্দ্র কর্তৃক তার উদ্ধারসাধন এবং স্বীকরণ ঘটে…

তারপর দেবীদাসীরই ইচ্ছায় তাহার পিতা কর্ণধার পালকে গ্রাম হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অপর একটি জনবহুল স্থানে নগদ কিছু টাকা দিয়া কায়েমী করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে—সেখানে সে চাকা ঘুরাইতেছে…

এবং এই বাড়ী ক্রীত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, সমরেন্দ্র দেবীদাসীর গার্হস্থ্য সরল চরিত্রে, মধুর ব্যবহারে, এবং অপার্থিব রূপে এবং অন্যান্য প্রশংসনীয় গুণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়া গেছেন, আর অবিরত অনুগত হইয়া থাকেন।

এদিকে, ডাল তরকারী ঢাকা হইয়াছে কি না সে খবর উজ্জয়িনীর লওয়া হইল না…কুকু কথা না শুনিলে অবাধ্যতার দরুন তাহাকে তিনি মারেন; সেদিকে তাঁর ভারি লক্ষ্য; কিন্তু আজ উজ্জয়িনী তা' লক্ষ্য

করিলেন না—অঞ্চল গুটাইয়া লইয়া তিনি দিবানিদ্রার পীড়ন সম্পূর্ণ দমন করিলেন···

শশীর কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিলেন—

বলিলেন—কি সাহস! গাঁয়ের বুকের ওপর এসে বসেছে! বলিয়াই ক্রোধে তাঁর নাকে নিঃশ্বাসে যেন ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। মুখপোড়াদের বিড়াল তরকারীতে মুখ দিয়া মুখ চাটিতে চাটিতে সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল—উজ্জয়িনী তাহা দেখিতে পাইলেন না।

শশী তাঁর প্রচণ্ড মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—টাকার মানুষ যে মা! টাকায় সব হয় মা, সব ঢাকা পড়ে।

কিন্তু উজ্জয়িনীর কাছে টাকা অতি তুচ্ছ—

বলিলেন—তা' হোক্। অমন টাকার মুখে আগুন। এই কেলেঙ্কারী করবে ওরা এই বামুন-ভদ্দরের গাঁয়ে, আর তা-ই লোকে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে!

কেলেঙ্কারী দেখিতে এখনও কেহ দাঁড়াইয়া যায় নাই; কিন্তু উজ্জয়িনী মনে করিয়াছেন, কোনো প্রতিবিধান না করিয়া লোকে দাঁড়াইয়া এখনই না দেখুক, দেখিতে দাঁড়াইয়া যাইবেই। অবশ্য, স্বতঃসিদ্ধভাবে কেন তিনি উহা মনে করিলেন তাহা তিনি জানেন না।

উজ্জয়িনী পুনরায় বলিলেন—ছি, ছি, ছি! যখন পালাল' তখন ভেবেছিলাম, গাঁয়ের কারু ঘাড়ে চাপেনি, এই ভাগ্যি!···সমস্ত গাঁ এবার উচ্ছন্নে যাবে—শশী, তুই তা' দেখে নিস্। বলিয়া শশীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াও তিনি শান্ত হইতে পারিলেন না; বলিলেন—রাগে আমার গা রি রি করছে।

শশী বলিল—মাগো, আমি ভয়ে মরছি।

উজ্জয়িনী আরো উত্তেজিতা হইয়া বলিলেন,—এখনই কি? আরো মরতে হবে।

ইত্যাদি আশঙ্কায়, আস্ফালনে, বিস্ময়ে, শিহরণে, কথা আটকাইয়া রাগে কাঁপিয়া, ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে জ্বালাতন বোধ করিয়া, ঘৃণায় কণ্টকিত এবং সংসারের আচরণে বীতস্পৃহ আর হতাশ হইয়া, গাঁয়ের পুরুষগুলিকে ইচ্ছানুরূপ গালি পাড়িয়া, অর্থাৎ নানা রঙের ইন্দ্রধনু এবং নানা পীড়ার যন্ত্রণা একই সঙ্গে সম্মুখে আগত দেখিয়া—যেন ঘূর্ণী জলে পাক খাইয়া খাইয়া সেই অশুভ দ্বিপ্রহরের কয়েক ঘণ্টা ওদের কাটিল…

সংক্ষেপে, উজ্জয়িনী নিজেও ক্ষেপিয়া গেলেন—বেচারা শশীকেও ক্ষ্যাপাইয়া তুলিলেন। শশীর বাছুর খোঁয়াড়ে গেল।

তারপর সংবাদটা বায়ুপথে ছুটিতে এবং ছড়াইতে লাগিল… সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই জানিতে কাহারো বাকি রহিল না যে, ঐ বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতেছে, ঐ বাড়ীর কর্ত্রী, ঐ বাড়ীর মালিক, আর কেউ নয়, এখানকারই পিলে—যৎসামান্য কর্ণধর পালের যৎসামান্যা কন্যা পিলে, যার নাম দেবীদাসী!

বটে?

এৎমামপুর ভড়্‌পাইয়া উঠিল—

মেয়েরা বলিতে লাগিলেন, কি ঘেন্নার কথা…!

পুরুষেরা বলিতে লাগিলেন, কি স্পর্দ্ধার কথা…!

এবং উভয়পক্ষই—অন্তঃপুর ও বহির্ব্বাটি—চোখ লাল করিয়া

রহিলেন···বহুক্ষণ চোখের লাল কাটিল না, এবং মনে হইল, রাগের এ লাল কাটিবার নয়।

একাধিক লোকের সম্মুখেই তারিণী গুপ্ত হঠাৎ অনুমান করিলেন ঃ "মহাভারতে এ-র চাইতেও অশুদ্ধ কথার উল্লেখ আছে"···

মহিম মিশ্র উষ্ণ হইয়া বলিলেন,—খবদ্দার!

পুরুষোত্তম বাগ্‌চি বলিলেন,—আমিও ত' মহাভারত পড়েছি—পাইনি' ত'!

—আছে। বলিয়া তরণীশঙ্কর চুপ করিয়া রহিলেন।

কিন্তু মহাভারতের নিন্দাবাদ সকলের চাইতে বিদ্ধ করিল ত্রিপুরেশ্বর চক্রবর্ত্তীকে; তিনি উগ্র হইয়া বলিলেন,—অব্রাহ্মণের এ অকারণ পাণ্ডিত্য বড়ই অসহ্য হে।

তারিণী গুপ্ত বলিলেন,—আছে। আদিপর্ব্বে, অশ্বমেধপর্ব্বে, সভাপর্ব্বে, উদ্যোগপর্ব্বে, কর্ণপর্ব্বে, দ্রোণপর্ব্বে, অনুশাসনপর্ব্বে পাবে।

—তুমি নিজে দুষ্ট, অসৎ প্রকৃতির, তাই তুমি দুষ্টের প্রশ্রয়দাতা, আর দুশ্চরিত্রতার সমর্থক; আর মহাভারতের অপমানকারী। তোমার সংসর্গ আমরা ত্যাগ করলাম। বলিয়া প্রথমে ত্রিপুরেশ্বর চক্রবর্ত্তী এবং তার পশ্চাৎ পুরুষোত্তম বাগ্‌চি তারিণীশঙ্করকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।

ক্রুদ্ধ জনমত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তারিণীশঙ্কর একা বসিয়া কৌতুকটা উপভোগ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এমন সাহস কাহারও হইল না যে, একক কিম্বা দলবদ্ধ হইয়া ঐ অট্টালিকার সম্মুখে গিয়া—দ্বারবানের সম্মুখীন হইয়া পিলে-ঘটিত ব্যাপারের প্রতিবাদ বা সমালোচনা বা কোনপ্রকার প্রতিকার-

চেষ্টা বা তার অদ্বৈতা সম্বন্ধে অমত প্রকাশ করেন। মনে সে কথা তাঁরা ভাবিতেও পারিলেন না, বলিতেও পারিলেন না।

কেবল কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যে ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইয়া এক সময় জানিতে চাহিলেন,—এ দ্বারোয়ানজি, বাবু হিঁয়াই হ্যাঁয়, না চল্ গিয়া হ্যাঁয়?

হিন্দীর দরকার ছিল না, গিরিরাজ পরিষ্কার বাংলায় বলিল,—ক'ল্কাতা গেছেন।

—আবার আয়েগা ত'?

হাঁ, হাঁ ফিন্ আবেঙ্গে। কা কাম্ হ্যায়?

হিন্দীতে প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করায় প্রশ্ন বড় কঠোর মনে হইয়া কাশীশ্বর আরো ভয় পাইয়া খুব তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলেন।

সবাইকেই ক্রুদ্ধ দেখা গেল—বিমর্ষ হইয়া গেল সূর্য্য কুমারী একা। ঐ বাড়ীটার নীরব সুরের যে অতীন্দ্রিয়ত্ব সে মনে মনে সম্ভোগ করিত, আর ছন্দে তাহাকে আকার দিয়া অমর করিয়া তুলিত, সেই অতীন্দ্রিয়ত্ব ঘুচিয়া গেল—অর্থাৎ কবির সুদূরের পিয়াসার এবং অপরিচিতার মারফৎ আদিতম সৃজন-প্রয়াসের সার্থকতা হউক এই প্রার্থনার কোন অর্থই থাকিল না।

দ্বিপ্রহর তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই—

আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিতা দুটি রমণী গিয়া সেই বিখ্যাত, এবং

অধুনা আরো বিখ্যাত অট্টালিকার ফটকে আসিয়া দাঁড়াইলেন··· দ্বারবান ত্বরিত-পদে আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল···

রমণীদ্বয়ের একজন অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বলিলেন,—আমরা ভেতরে কি যেতে পারি, বাবা? এ-বাড়ীর গিন্নী—

বলিতে যাইতেছিলেন, "আমাদের আপনারই লোক।"

কিন্তু বলার দরকার হইল না; দ্বারবান সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,— যান্, মাইজীর হুকুম আছে।

রমণীদ্বয় মন্থরপদে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু বুক যেন অকারণেই দুরু দুরু করিতে লাগিল...বাড়ীর চাকচিক্য তাঁদের চোখের উপর ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল; আরামের আয়োজন, আর সমুদয়ের উচিত মূল্য তাঁরা অনুভব করিতে লাগিলেন···না জানি কত টাকাই না খরচ করিয়াছে ভাবিয়া দিশা না পাইয়া অবাক্ হইতে হইতে তাঁহারা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দোতলার বারান্দায় উঠিয়া গেলেন, এমন একটা ছম্‌ছম্ অস্বস্তির ভাব লইয়া, যেন চুরি করিতে আসিয়াছেন, এবং ধরা পড়িবার সম্ভাবনা বিস্তর।

সকলগুলি ঘরেরই শিকল তোলা—

একটি ঘরের দরজা খোলা ছিল; উভয়ে গিয়া সেই দরজার সম্মুখে দাঁড়াইতেই কি যে একটা অভাবনীয় অনন্ত ব্যাপার চক্ষের পলকে ঘটিয়া গেল তাহা বলা যায় না—চোখ যেন ঝল্‌সিয়া বুজিয়া আসিল···

রূপের দিকে যে সর্ব্বদাই অসঙ্কোচে আর অকাতরে নেত্রপাত করা যায় ইহা সত্য নহে। উঁহারা দেখিলেন, সম্মুখে যাহাকে দেখা যাইতেছে

সে তাঁহাদের সেই পুরাতন পিলেই বটে ; কিন্তু তাহার দেহে রূপান্তর যাহা ঘটিয়াছে তাহা মানুষে এমন অকস্মাৎ চোখে দেখিবে বলিয়া প্রত্যাশা করিতে পারে না—ইহার রূপ যেন জাগতিক সকল নিয়ম আর সকল সম্ভাবনাকে পরাস্ত আর অতিক্রম করিয়া গেছে !

ঐ রূপ দেখিয়াই উঁহাদের মুখে শব্দ ফুটিল না—

তার উপর ঐ সোনা—অঙ্গে অঙ্গে অশেষ—কর্ণে, কণ্ঠে, বাহুতে, মণিবন্ধে···অলঙ্কার যে কত প্রচুর, আর কত যে তার মূল্য তাহার ইয়ত্তা তাঁরা করিতে পারিলেন না—কেবল অনুভব করিতে লাগিলেন, দৃষ্টিতে যেন দুঃসহ হইয়া একটা নিরবচ্ছিন্ন আলোক-তরঙ্গ চোখের উপর নাচিতেছে···

পালিশ-করা সোনা ঝিক্‌মিক্ করিবেই ; যাহার গায়ে সে-গুলি রহিয়াছে সে-ও চিরকালের পরিচিত মানুষ, একেবারে জানা ; কিন্তু একেবারে জানা মানুষটির দিকে চাহিয়া এখন উঁহাদের মনে হইল কেবল সেই পূর্ব্ব-পরিচয়ের সূত্রে এখন উহাকে ঘনিষ্ঠ সম্ভাষণ করিবার বিরুদ্ধে যেন দুর্লঙ্ঘ্য একটা নিষেধ ঐ অপরিমেয় স্বর্ণের অতি উজ্জ্বল দীপ্তির মধ্যেই আছে।

ভুবনমোহিনী যে প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হইতেছে সে প্রতিমা পরিচিতই ; মূর্ত্তি কথা কহিয়া উঠিলেই অচেতন রূপ যথার্থ সজীব হইয়া উঠে ইহাও ঠিক্ ; কিন্তু ইহাও সত্য যে হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর শুনিয়া পলায়ন করিবে না, এমন লোক বিরল।

ওঁদের সেই পিলে যেন তেম্‌নি আতঙ্কজনক আর অত্যন্ত পরিস্ফুট একটা সজীবতা লাভ করিয়াছে—মৃণ্ময়ী যেন চিন্ময়ী হইয়া উঠিয়াছে ;

তার অন্তরেই অকলঙ্কিত আভিজাত্য যেন ঐ অলঙ্কারের ঘটায় ছটায় একটা রোমহর্ষক অলৌকিক ভাষায় ধ্বনিত হইতেছে···

সুতরাং ওঁরা থমকিয়া রহিলেন···যত পরামর্শ বহু যত্নে করিয়াছিলেন; ভর্ৎসনা করিবেন, রাগ করিবেন বলিয়া যে অনিবারণীয় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; ফল-সাধক যত কথা বলিবেন বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছিলেন সে সমস্তই যেন বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ আঘাতে অন্ধ এবং অসাড় হইয়া গেল।

দেবদাসী উঁহাদের পদ-শব্দ পাইয়াছিল; তার বুঝিতে কষ্ট হয় নাই যে গ্রামের স্ত্রীলোক কেহ আসিতেছে···গ্রামের লোককে পুনরায় দেখিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা তার থাকিলেও একটা লজ্জাও তার ছিল; তার ভয় না হইয়াছিল এমন নয়—

কিন্তু সাক্ষাতের প্রথম মুহূর্ত্তেই তাহাই ঘটিয়া গেল যাহা ঘটিবে বলিয়া ওঁরাও মনে করেন ওঁরাই তাহাকে নিষ্কৃতি দিলেন··· উঁহাদের মনের সমীহ আর সঙ্কোচ, অর্থাৎ দুর্ব্বলতা, একেবারে স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়িতেই দেবীদাসীর নিজের দুর্ব্বলতা, এক নিমেষেই ঘুচিয়া গেল . তা' ত' গেলই, অধিকন্তু তাহার তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, উঁহারা অবিসম্বাদিতভাবে স্বীকার করিয়াছেন, এই তিনের মিলনক্ষেত্রে তাহারই স্থান উচ্চে

দেবীদাসী ওঁদের চোখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া অগ্রসর হইয়া গেল; বলিল,—জেঠিমা, আসুন; পিসীমা, আসুন, বলিয়া উপুর হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

ওঁদের একজন পূর্ব্বকথিতা উজ্জয়িনীর অত্যন্ত আপনার লোক

স্বামীর সাক্ষাৎ ভগিনী, দেবমায়া তাঁর নাম ; আর একজন কাশীশ্বরের আবাল্যের সহধর্ম্মিণী ইচ্ছাময়ী।

উভয়ে সটান মেঝেয় বসিলেন—

দেবীদাসী ব্যস্ত হইয়া আসন দিতে চাহিলে তাহাকে নিবারণ করিলেন ; বলিলেন "এই খানেই বসি ; দিব্য পরিষ্কার। বলিয়া ও'রা চারিদিকে চোখ ফিরাইয়া বড় বড় ছবি, বড় বড় আয়না, ভাল ভাল চেয়ার, মোটা পালঙ্ক আর গদি প্রভৃতি তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন···অবাক্ দৃষ্টি মুগ্ধ হইয়া গেল।

সেই অবসরে দেবীদাসী গিয়া ক্যাস্-বাক্স খুলিয়া দশটি টাকা বাহির করিল ; এবং ফিরিয়া আসিয়া পাঁচটি করিয়া টাকা উহাদের পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিয়া গলায় আঁচল দিয়া পুনরায় এবং অধিকতর ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

শয্যার দিকে চাহিয়া একটা অপবিত্রতার চিত্র মনে পড়িয়া এবং একটা অপবিত্রতার ছোঁয়াচ লাগিতেছে মনে করিয়া উঁহাদের মন গুটাইয়া আসিতেছিল—টাকা পাঁচটি প্রণামী পাইয়া সঙ্কুচিত মন তৎক্ষণাৎ বিস্তৃতি লাভ করিল—তা' ছাড়া লক্ষ্মীর দৃষ্টি লাগিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্যভাবে একটা প্রফুল্লতাও লাভ করিল।

ইচ্ছাময়ী টাকা পাঁচটি ডানা হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া বাঁ হাতে করিলেন ; তারপর দেবীদাসীর চিবুকে আঙুল ছোঁয়াইয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন, এবং ভাবিয়া রাখিলেন, দেবীদাসীর সঙ্গে যে এই ছোঁয়াছুঁয়ি হইয়া গেল সে-কথাটা কাহাকেও বলা হইবে না। দেবমায়া টাকা পাঁচটি আঁচলে বাঁধিলেন, ইত্যাদি···

কিন্তু দু'জনার কেউ কথা খুঁজিয়া পাইলেন না—"আজ কি রেঁধেছিলে?" জিজ্ঞাসা করা এখানে চলিবে না।

দেবীদাসীই সুরু করিল ; বলিল—তোমাদের কাছেই আবার ফিরে এলাম, মা। পায়ে রেখ'।

ইচ্ছাময়ী বলিলেন,—সে কি বল্‌ছিস্ পিলে?

বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন…কে কাহাকে আশ্রয় দিতে সমর্থ তাহার দিশা তিনি সত্যই পান নাই।

দেবমায়া বলিলেন,—সেই অবধি আমরা ভেবে বাঁচিনে—না জানি পিলে কি দশায় পড়েছে!

কথাগুলি মিথ্যা—তাঁহারা কেহ অমন কথা ভাবেন নাই।

পিলে বলিল,—দশা খুব খারাপই হ'ত, পিসীমা, যদি ইনি স্থান না দিতেন।

কর্ণধর পালের কন্যা পিলে এমন উজ্জ্বল,—এমন সহজ আর সপ্রতিভ, আর মহিমান্বিত, আর ভঙ্গীর উল্লাসে এমন দুর্নিবার আর সুষমাময়ী হইয়া উঠিতে পারে ইহা কেহ জানিত না…ডালিম ফুলের যে রং সেই রঙের সাড়ী একখানি পরিয়া এবং সোনায় গা ঢাকিয়া সম্মুখেই সে বসিয়া আছে ; কিন্তু মনে হইতেছে, সে যেন দুর্নিদ্দেশ্য একটি পরীর মত আপন অঙ্গচ্ছটার চমক্ হানিয়া উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে—কোনোখানেই তার সীমা নাই …

ও'রা হা করিয়া শুনিতে লাগিলেন—

পিলে তাঁর ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের কাহিনী বলিতে লাগিল,—সে লোকটা ত' আমাকে একটা খারাপ বাড়ীতে রেখে' দু'দিন বাদেই পালিয়ে গেল।

সেই বাড়ীতে ইনি মাঝে মাঝে আস্‌তেন। তারপর আমাকে দেখতে পান্‌।

পিলের ভাগ্য সম্বন্ধে এতক্ষণের উৎকণ্ঠা দূর হইয়া উভয়েই সমস্বরে বলিলেন,—ভালই হ'ল

—ভালই হ'ল বৈ কি। খুবই ভালবাসেন; কত যে দিতে চান্‌ তার ঠিক্‌ নাই। আমিই তাঁকে থামিয়ে থামিয়ে রাখি যে, অত দিয়ে কি হবে! বলিয়া পিলে একটু সুখের হাসি হাসিল...

এমন করিয়া হাসিতে কি সে পারিত! না, শিখিত!

ইচ্ছাময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—এ বাড়ী ত' তোমারই?

পিলেকে 'তুমি' সম্বোধন অজ্ঞাতে বাহির হইয়াছে।

পিলে বলিল—আমার নামেই করেছেন।

—সায়েব ম্যানেজার না কি আছে?

—না। ম্যানেজার বাঙ্গালীই—আগে তিনি ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

—আয় কত হবে?

—পৌণে দু'লাখ্‌। বলিয়া পিলে ইচ্ছাপূর্ব্বকই থামিল না...ওঁদের চমক্‌ খাওয়াটা চোখে পড়িয়াছে বুঝিতে পারিলে ওঁরা অপ্রতিভ হইতে পারেন মনে করিয়া পিলে বলিতে লাগিল—কিন্তু যাকে ভালবাসেন তার পিছনে বাজে খরচ কি এত!...বলিয়া সৌভাগ্যের গৌরবে না হোক্‌ প্রণয়গর্ব্বে পিলে আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

চারিদিকে চাহিয়া উহাদেরও তাহাতে সন্দেহ রহিল না—প্রয়োজনের

অতিরিক্ত সবই, যেন খেলা খেলা ; এত বাহুল্য দ্রব্য তাঁহাদের আয়ত্তাধীনে স্বপ্নেও নাই ; তাঁরা জীবনে দেখেন নাই।

দেবমায়া বলিলেন—তোমারও খরচের হাত কম নয়! বলিয়া হাসিলেন—সেটা স্তুতির প্রফুল্লতা, কৃতজ্ঞতার প্রয়োজনীয় হাসি।

পিলে বলিল—না হ'য়ে উপায় নেই। উনি বলেছেন, গ্রামের সবাই তোমাদের ভালবাসতেন। যদি কেউ কখনো দয়া করে' অভাবের কথা জানান্ তবে তোমার যা' ইচ্ছে যত ইচ্ছে দেবে—আমার অনুমতি দে'য়া রইল।

"দয়া করে' অভাবের কথা জানান্"···এই কথাগুলির জন্য উঁহারা বাবুকে অধিকতর শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন ; কারণ দান করিয়া ধন্য হওয়ার প্রবৃত্তি খুব উচ্চাঙ্গের বৈষ্ণবী মানসিক উন্নতির লক্ষণ—এবং সকলের তা' হয় না।

ইচ্ছাময়ী গদগদস্বরে বলিলেন—একেবারে দেব্তা মানুষ।

দেবমায়া বলিলেন—যা' বলেছ, ইচ্ছে! দেব্তাই।

পিলের জীবনেতিহাসের এই অংশটুকু শ্রবণ করিয়া উঁহাদের কি মনে হইল তাহা পিলে না জানিলেও আমরা জানি। অভাব-অনটনের উর্দ্ধে উঠিয়া এই অপরিসীম স্বাধীনতা-সম্ভোগ জীবনের প্রধানতম কাম্য বলিয়াই উঁহাদের মনে হইল—চিরদিন স্বর্গীয় ঐ স্বপ্নই উঁহারা দেখিয়াছেন। ধূলা নয়, বালি নয়, নগদ টাকা লইয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করার, প্রায় ছিনিমিনি খেলার মত যাহার অবস্থা এবং উন্মুক্ত স্বাধীনতা, তাহার অদৃষ্ট যে কত সুপ্রসন্ন আর ভাগ্য-বিধাতার আশীর্ব্বাদ

যে তাহার প্রতি কত প্রচুর, তাহা সন্তোষজনকভাবে ধারণা করিতেই পারা যায় না।···দৈন্য আরো বাড়িবার বিরুদ্ধে অষ্টপ্রহরই যাঁ'দের তীক্ষ্ণ সতর্কতা, তাহাই লইয়া কলহ, তাহারই দরুণ বিচ্ছেদ, সেই দৈন্যের ফলে হয়তো অকাল মৃত্যুই ঘটিতেছে; ভিক্ষাবাবদ একমুষ্টি চাল খরচ করিতে যাঁদের সম্বলে শিরায় টান পড়ে—এম্‌নি নিষ্পেষিত যাঁহাদের অবস্থা, তাঁহারা টাকার অত অবাধ আর নিঃস্পৃহ ব্যবহার দেখিয়া নিশ্চয়ই বিস্মিত হইয়া যাইবেন···সেই জীবনকে উদার বৈকুণ্ঠবাস—মর্ত্যে স্বর্গের অবতরণ—মনে করিবেন বৈ কি!

বৈকুণ্ঠবাসিনীর সম্বন্ধে উপস্থিত অব্যক্ত একটা বিস্ময়ের ঘোর লইয়া উঁহারা উঠিলেন—পিলে আবার প্রণাম করিল—পুনরায় আসিতে বলিল—আরো অনুরোধ করিল, যাঁহারা দয়া করিয়া পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করিতে সম্মত তাঁহারাও যেন আসেন···

ইচ্ছাময়ী বলিলেন—আস্‌বে বৈ কি···

"তুমি আমাদের বল ভরসা আশ্রয়"—এই কথাগুলি তাঁর মুখ দিয়া বাহির না হইলেও মনের সহস্র উৎস মুখে মুহুর্মুহুঃ বাজিতে লাগিল।

সর্ব্বশেষে শুধাইলেন কর্ণধরের কথা—

দেবমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার বাবা এখন কোথায়?

পিলে বলিল—কৃষ্ণনগরে আছেন।

—ভাল আছে?

—খবর পেয়েছি, ভালই আছেন।

উভয়ে বলিলেন—বেশ।

একদিন অশুভ প্রাতে দেবীদাসীর পলায়ন করিবার ঘৃণ্য কথাটা কর্ণধরের স্নেহধর্ম্ম আর অবিবেচনার দরুণ যত বেগে রাষ্ট্র হইয়াছিল, তার চতুর্গুণ বেগে তাহার পুনরাগমনের সংবাদ ত' বটেই, রাজ্ঞীর পদে প্রতিষ্ঠার সংবাদ, আর উপকার করিবার অকপট অভিপ্রায়ের সংবাদও প্রচারিত হইয়া গেল—

লোকের সেদিন সুপ্রভাত !

ইচ্ছাময়ী বলিয়াছিলেন—"আস্‌বে বৈ কি"—

যাঁহাদের তরফ হইতে তিনি পিলেকে ঐ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাঁহারা হীনচেতা নন্—ইচ্ছাময়ীর তরফের সত্যটা তাঁরা নির্ব্বিবাদে রক্ষা করিলেন—অর্থাৎ আসিলেন···

প্রণামী পাঁচ টাকা নগদ পাওয়া গেছে এই সংবাদটা পরবর্ত্তী সংবাদ হইয়া ধীরে সুস্থে রটিলেও, বিদ্যুৎ-চমকের পর মেঘের ডাকটাই যেমন ঘোরতর বেশী আর সাড়া জাগায়ও বেশী, তেম্‌নি আলোড়ন তুলিল সে-ই বেশী।

যাঁহারা পদধূলি দিতে সম্মত তাঁহারা আসিলেন—

অকাতরে পদধূলি দিলেন···

এবং দু'তিন দিনেই দেবীদাসীর দেড় শত টাকা, উড়িয়া গেল বলা যায় না, জলে পড়িল বলা যায় না, পূজার ফুলের মত সার্থক হইয়া গেল···

সূর্য্য কুশারীর স্বপ্নও সার্থক হইল—

তার দিদি, চন্দ্রিকা (৩৩), গিয়া দেবীদাসীর প্রণাম ও প্রতিশ্রুতি লইয়া আসিলেন যে, "ধরণীর ধূলা" ফুলের পাঁপড়িতে নয়, কাগজেই

পুস্তকাকারে ছাপিবার সমুদয় খরচ সে দিবে ; কারণ, গুণীর গুণ সে বোঝে ; "উনিও" বোঝেন।'

কিন্তু এই কি সব! দেবীদাসীর বদান্যতা আরো প্রচুর, তাহার হৃদয় আরো প্রশস্ত, আকর্ষণ আরো মিলনাত্মক···

একদিন সকালবেলাই সিধে' দেওয়া আরম্ভ হইল—পিতলের একটি বালতি, তাহা পূর্ণ করিয়া সের দশেক আতপ চাল, এবং কাঁসার বাটীতে করিয়া পোয়া তিনেক গাওয়া ঘি—

সে আধার অর্থাৎ পিতলের বালতি সমেত ব্রাহ্মণেরা পাইলেন—তার সঙ্গে পাইলেন দক্ষিণা দু'টাকা···

দেখিয়া তারিণী গুপ্ত বাড়ীর ভিতরে এবং বাড়ীর বাহিরেও রাগে গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন···বাড়ীর ভিতরে সায় এবং অনুকম্পা পাইলেন বটে, কিন্তু বাহিরে কেহ আমল দিল না···

অচ্যুত চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় তারিণী গুপ্তও ছিলেন—

অচ্যুত বলিলেন—ওর পাপ ধুয়ে মুছে' গেল।

নটবর বিদ্যাবাগীশ বলিলেন—শুধু ধুয়ে মুছে? অমন পুণ্যাত্মা আর নেই।

কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যে বলিলেন—মনে যার ময়লা নেই সে-ই ত' ধন্য। অমন দানশীলা রমণী দেশের গৌরব।

মহাভারতের কুৎসাকারী অপবাদে ত্রিপুরেশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং অব্রাহ্মণ বলিয়া দেবীদাসী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তারিণী গুপ্তের মনে বিষ সঞ্চিত হইয়াছিল ; বলিলেন—হ্যাঁ, দিলে থুলেই গৌরব। কানা পুতের নানা রোগ। তোমরা বড় উঞ্ছ-পরায়ণ!

মহিম মিশ্র মহাভারতের নিন্দায় উষ্ণ হইয়াছিলেন ; এখন হাসিয়া বলিলেন—বামুনরা চিরকালই তা-ই। রাগ করলে উপায় নেই, ভায়া।

কিন্তু ঠিক এই সময়েই আর একটা আবিষ্কার যাহা রাস্তার ধারে ঘটিতেছিল তাহাও অসামান্য, তাহাও আনন্দপ্রদ...

ত্রিপুরেশ্বর চক্রবর্ত্তী ঐ বাড়ীটার সম্মুখ দিয়া আসিতেছিলেন ; কোন্ বাড়ীটা তাহা না বলিলেও চলে...ঐ বাড়ীটার সৌন্দর্য্য এবং দৃশ্যাতীত একটা অসাধারণ গুরুত্ব দাঁড়াইয়া গেছে বলিয়া বাড়ীটার দিকে তাকানই নির্ম্মল আনন্দ লাভের অন্যতম উপায় এবং একটা কাজের কাজ দাঁড়াইয়া গেছে। ত্রিপুরেশ্বর আনন্দপূর্ব্বক ঐ দিকেই তাকাইয়া পথ চলিতেছিলেন···হঠাৎ তাঁর চোখে প.ড়ল, একটি মনুষ্যমূর্ত্তি [illegible] করিয়া ফটকের থাম্‌টার আড়ালে সরিয়া গেল···

সন্দেহ হওয়ায় ত্রিপুরেশ্বর থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন—

উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলেন—কে, কর্ণধর নাকি ?

বলিতেই আর কেউ নয়, কর্ণধরই আড়াল ছাড়িয়া প্রকাশ্যে আসিয়া দাঁড়াইল···

ত্রিপুরেশ্বর পুনরাগত মিত্রকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন ; মিলনোল্লাসে পুলকিতকণ্ঠে কলরব করিতে লাগিলেন—এস, এস, কর্ণ।···এসেছ ভালই হয়েছে—তোমায় আমরা বড় ভালবাসতাম। দেখে আনন্দ হ'ল। ভাল আছ ?

—আজ্ঞে। বলিয়া কর্ণধর রাস্তায় উঠিয়া আসিল।

ত্রিপুরেশ্বর কর্ণধরের কাঁধের উপর হাত তুলিয়া দিলেন, কর্ণধরকে

গায়ের দিকে টানিয়া লইলেন···তারপর যেন তাঁর নিজস্ব সম্পদ পুনরাবিষ্কৃত হারা-নিধিকে পুনরাবিষ্কারের গৌরবসহ গ্রামের লোককে দেখাইতে চলিলেন।



ত্রিলোকপতির তীর্থ-ভ্রমণ

পায়ের চটির একটা ছুটোপুটি শব্দ করিতে করিতে ত্রিলোকপতি গুরুদাসের বৈঠকখানার দরজায় পৌঁছিয়াই থম্‌কিয়া গেল। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর যে উদ্দেশ্যে সে আসে আজও সে সেই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছে, একটু ব্যগ্র হইয়াই আসিয়াছে। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হইবার আশা বৈঠকখানার দুয়ারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। গুরুদাস আর সে দাবা খেলে। গুরুদাস বৈঠকখানায় উপস্থিত আছে বটে, কিন্তু দেখা গেল, একটি অপরিচিত ভদ্রলোকও সেখানে বসিয়া আছেন—শুধু ভদ্রলোক তিনি নন্, তিনি যে অবস্থাপন্ন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাহা এক নজরেই স্পষ্ট বুঝা গেল। বসিয়া তিনি আছেন, কিন্তু যেমন তেমন করিয়া বসিয়া নাই—এমন ভঙ্গীতে বসিয়া আছেন, যাহা সহজ অথচ গম্ভীর এবং শিষ্ট—পরিচ্ছদে একটা শুভ্র সমারোহ আছে—পরিচ্ছদ মূল্যবান নয়, কিন্তু শোভন। নিজেকে কি পোষাক মানায়, বিকৃত রুচির দরুণ অনেকেই তাহা বুঝিতে পারে না, কিন্তু ইনি বেশ পারিয়াছেন বলিয়া ত্রিলোকপতির মনে হইল।

ভদ্রলোকের আগমনের কারণ, অর্থাৎ অতিথিসমাগমের ব্যাপারটা সাধারণ নয়, তাহাও ত্রিলোকপতি বুঝিল। গুরুদাসের সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লণ্ঠনটি বৈঠকখানায় আনা হইয়াছে, যাহা আনাইতে ত্রিলোকপতি এবং অন্যান্য বন্ধুরা রাগে চীৎকার করিয়াও পারে নাই। ফরাসের ধূলিপূর্ণ সেই অনাদি সতরঞ্চির উপর পরিষ্কার চাদর বিছান হইয়াছে, গড়গড়াটা মাজা হইয়াছে, সট্‌কাটাও নূতন ; কলিকাটি সুবৃহৎ ; গন্ধে বুঝা গেল যে-তামাক আজ পুড়িতেছে তাহা নিত্যসেব্য ছ'আনা সের তামাক নহে—ইঁহারই তুষ্টির জন্য এবং সম্মানার্থে মূল্যবান্ তামাক গুরুদাস আনিয়াছে।...তাহার উপর ত্রিলোকপতি আরও লক্ষ্য করিল যে,গুরুদাস নিজে খালি গায়ে নাই—জামা পরিয়া নিজেরই বৈঠকখানায় আসিয়াছে। কেবল তাহাই নহে—সে বিশেষ উৎসাহিত কৃতার্থ এবং বিনীতভাবাপন্ন হইয়া খালি বসিয়া নাই, যেন অনুগ্রহ পাইতে দরবারে হাজির আছে।

এ-সব দেখিতে এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে ত্রিলোকপতির বেশীক্ষণ লাগিল না।

গুরুদাস যখন অত্যন্ত সম্ভ্রান্তভাবে বলিল : "এস, ত্রিলোক, বস।" তার পূর্ব্বেই সে গুরুদাসের নিজের এবং তার বৈঠকখানার এই ভালর দিকে পরিবর্ত্তন দেখিয়া লইয়াছে।

ফরাসে স্থান সংকীর্ণ বলিয়া এবং বিশিষ্ট ভদ্রলোকটিকে যথেষ্ট ব্যবধানে রাখিতে হইবে বলিয়া ত্রিলোকপতি লোহার চেয়ারে বসিল—বসিয়া গুরুদাসের তেঁতুলে মাজা গড়গড়ার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল···

গুরুদাস খুব আভিজাত্যের সহিত বলিল,—ইনি রঘুনাথগঞ্জ থেকে এসেছেন—শিউলিকে দেখ্‌তে।

রঘুনাথগঞ্জের নাম ত্রিলোকপতি শুনিয়াছে, কিন্তু শিউলি ব্যক্তিটা তাহা ত্রিলোকপতি স্বপ্নেও জানে না,—কিন্তু বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সম্মুখে অজ্ঞতা প্রকাশ করা চলিবে না—বিজ্ঞভাবে বলিল—ও।

কিন্তু ঘটনা এই, শিউলি আর কেহই নয়, গুরুদাসেরই সহোদরা।

ত্রিলোকপতি এ-দেশে কর্ম্মোপলক্ষে মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে আসিয়াছে এখানকার মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব জন্মিলেও, কাহার জ্ঞাতি আত্মীয় কুটুম্ব স্বজন কোথায় কে বাস করে সে-খবর সে পায় নাই।

তবে রঘুনাথগঞ্জ হইতে ইনি শিউলিকে দেখিতে আসিয়াছেন শুনিয়া হাত তুলিয়া সে ভদ্রলোকটিকে নমস্কার করিল—তিনিও প্রতি-নমস্কার করিলেন; কিন্তু কথা হইল না। ত্রিলোকপতি একটু লাজুক স্বভাবের লোক—এদিকে চিন্তাশীল, ভক্তিপরায়ণ এবং ওদিকে দাবার চালে' প্রত্যুৎপন্নমতি-সম্পন্ন হইলেও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে অবান্তর কথা তুলিয়া আলাপ জমাইতে সে ভাল পারে না—কথাবার্ত্তায় ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচারের প্রয়োজন আছে তাহা সে মনে করে; আবার ইহাও তার মনে হয়, কষ্টের সঙ্গেই মনে হয় যে, বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে কথোপ-কথন প্রস্তুত এবং প্রবাহিত করিবার উপযুক্ত ভাল ভাল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার কিছুই জানা নাই।

রঘুনাথগঞ্জের ইলিশ মাছ সস্তা কি না, কবিরাজ প্রচুর কি না, গঙ্গা তার কোন্ দিকে, এখানকার মত সেখানেও পথে ধুলা যথেষ্ট কি না, ডাক দু'বেলা কি একবেলা বিলি হয়, পাকা বাড়ীর সংখ্যা বেশী কি কাঁচা বাড়ীর সংখ্যা বেশী, বালাপোষের কারখানা রঘুনাথগঞ্জে আছে কি না, গুটিপোকার আবাদ ওদিকে কোথায় কোথায় হয়, এ-স্থান হইতে

যাতায়াতের রেলভাড়া কত' ইত্যাদি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করা যাইত; কিন্তু বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি বাজে কাজে এখানে আসেন নাই—গুরুদাসের বাড়ীর, বোধ হয় গুরুদাসের পরমাত্মীয়াই—শিউলিকে দেখিতে আসিয়াছেন, এবং দায়িত্বপূর্ণ আর ভাবনার একটা ব্যাপার উভয় পক্ষেরই ঘটিতে যাইতেছে; দ্বিতীয়তঃ, ভদ্রলোকটির চোখের দিকে তাকাইয়া মনে হয়, ইহার প্রভুশক্তি অত্যন্ত প্রবল···সুতরাং ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইবে, ইহাই মনে করিয়া ত্রিলোকপতি একটা নমস্কারেই কর্ত্তব্য শেষ করিয়া চুপ্ করিয়া রহিল...একটা দেনাপাওনা পছন্দ-অপছন্দের দ্বন্দ্বও ভিতরে ভিতরে পীড়া না দিক্, ভিতরে আছে, চুপ্ করিয়া বসিয়া ত্রিলোকপতি তাহাই অনুভব করিতে লাগিল।

আগেই অনেক কথা নিশ্চয়ই হইয়া গেছে—গুরুদাস এখন খুব উদাত্তকণ্ঠে বলিল,—আগেও আপনাকে বলেছি, আবারও বল্‌ছি, আমি দরিদ্র, কিন্তু উচ্চাভিলাষী। আপনার ছেলের সঙ্গে আমি আমার সহোদরার বিবাহ দিতে চাই, এতেই আমার উচ্চাভিলাষ কত তা' বুঝ্‌বেন।

গুরুদাসের উচ্চাভিলাষের কথাটা, বলিবার ভঙ্গীর দরুণ, কতক্ দম্ভের মত শুনাইল, এবং ত্রিলোকপতি বুঝিল, গুরুদাস ইহার কাছেও নির্ব্বিবাদে খাটো হইতে চায় না।

ভদ্রলোকটি মৃদু একটু হাস্য করিলেন—ত্রিলোকপতির মনে হইল, ইনি চট্ করিয়াই হাসেন না, হাসির ভাণ্ডার হইতে হাসি যেন চুয়াইয়া বাহির হয়, এম্‌নি ধীরে ধীরে হাসেন।

—বলিলেন,—বেশ। ছেলেটাকে এখনও ত' দেখেননি!

শুনিয়া গুরুদাস খুব মুরুব্বিভাবে একটু হাসিল; বলিল,—সে খাঁমের দেখাই। পিসীমা যা' লিখেছেন তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয় তা' আমি জানি। আর একটি কথা—ছেলে যে আপনার। বলিয়া গুরুদাস আনন্দে গদগদ হইয়া গা দুলাইল...

ত্রিলোকপতির মনে হইল, যে-টুকু বাকি ছিল, ঐ কথার দ্বারাই গুরুদাস যেন তাহা শেষ করিয়া আনিয়াছে, অর্থাৎ বিবাহ হইবেই—কিছু বাদসাদ দিতে চাহিলেও ইনি আস্কারা দিবেনই।

—তামাক খান। বলিয়া রঘুনাথগঞ্জের ভদ্রলোকটি অচঞ্চলভাবে গড়গড়ার নল নামাইয়া রাখিতেই গুরুদাস যত লজ্জিত তত বিহ্বল হইয়া গেল, গড়গড়ার উপর হইতে সন্তর্পণে কলিকাটি তুলিয়া লইয়া এবং তাড়াতাড়ি নিজের হুঁকাটি তুলিয়া লইয়া ঘরের বাহিরে আসিল—সহোদরার শ্বশুর যিনি হইবেন তিনি এখন হইতেই গুরুজন বৈ কি!

বারকতক হুঁকা টানিয়া গুরুদাস ডাকিল,—ত্রিলোক, শোনো।

ত্রিলোক শুনিতে গেল, কিন্তু তার মনে হইতেছিল, বিবাহব্যাপারে, সুকোমল শুভদ আর সুখদ বিবাহব্যাপারে, দেনাপাওনার কথাগুলি বড় কর্কশ লাগে—নানাপ্রকারের দেনাপাওনার উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহা আদায় করা—আর তার প্রতিবাদ, মানুষের ভাল লাগার কথা নয়—স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে নয়, বাধ্য হইয়া, টানাটানিতে অবসন্ন হইয়া, দুঃসাধ্য বিবাহব্যাপার চুকাইতেই হইবে—ইহাতে মনটা বড় ধিক্ ধিক্ করে। যাহার নাম বিবাহ, অর্থাৎ চিরজীবী একটা মিলন, তাহারই সূত্রপাতে এই বাজার-দর দেখান' আর তাই কাটান'

কেমন যেন কটু লাগে—মনে হয়, বিবাহের সম্ভ্রমহানি ঘটিতেছে, তার মাধুর্য্যের চমৎকারিত্ব নষ্ট হইল।...যদি এমন হয় যে, একটি ছেলে আর একটি মেয়ের ভাব হইল—বিবাহে তাহারা সম্মত হইল—তখন তাহারা হাতধরাধরি করিয়া গেল মন্দিরে···পুরোহিত তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া দেবতার আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিলেন—একাত্মকারী মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক তাহাদের মস্তকে নির্ম্মাল্য স্পর্শ করাইলেন···শ্বেতচন্দনে তাহাদের ললাট চর্চ্চিত করিয়া দিলেন···দেবতাকে জাগ্রত জানিয়া তাঁহারই গোচরে তাহারা বিবাহিত হইল···

যদি এমন হয় তবে মন্দ হয় না—অনেক দাহ জন্মেই না।

গুরুদাস চুপি চুপি বলিল,—পঁচিশ ভরি সোনা চায়; দু'ভরি কমিয়ে তেইশ ভরিতে রাজি করেছি, অনেক কেঁদে-কেটে; হাজার-এক নগদ, তার উপর খাট-বিছানা, ঘড়ি-বাসন ইত্যাদি। প্রায় আড়াই হাজার কেবল দিতে হবে।

শুনিয়া ত্রিলোক আর্ত্তনাদ করিল; বলিল,—বাবা!...তারপর বলিল,—তোমার সহোদরা আছে তা' জান্‌তাম না—তা' আবার বিয়ের উপযুক্ত। বয়স হ'ল কত তাঁর?

—পনর চল্‌ছে নির্ব্বিবাদে। তুমি ভেবেছ বুঝি যে তাড়াতাড়ি গৌরীদান করছি, তা' নয়। তবে ছেলেটি ভাল, এম্, এ, পড়ে—দেখতে শুন্‌তে চমৎকার—লম্বা চৌড়া সুপুরুষ—পয়সাওলা। এটাকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইনে। বলিয়া গুরুদাস হুঁকা লইয়া উঠিল।

ত্রিলোক বলিল,—আমি যাই।

—আচ্ছা, এস। কাল এস। আজ আর খেলাটা হ'ল না। ফলাফল কা'ল শুনো।

ত্রিলোকপতি রাস্তার জ্যোৎস্নায় নামিয়া তার বাসার দিকে চলিতে লাগিল; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেছে। ফুলের কোরকের অভ্যন্তরে যেমন পরাগ থাকে, তেম্‌নি একটি সূক্ষ্ম সুকোমল বস্তুকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া তাহার হৃদয় যেন মুদিত হইয়া গেছে...

পথে চলিতে চলিতে ত্রিলোকপতির সেই কোরকদৃশ্য পেলব অন্তরের অভ্যন্তর হইতে বিচিত্র রসস্রোত নির্গত হইতে লাগিল, অর্থাৎ সে ভাবিতে লাগিল, সর্ব্বস্ব নগদ দিয়া কে নিঃস্ব হইতে যাইতেছে সে কথা নয়, গুরুদাসের সহোদরা শিউলির বিবাহের কথা...

ত্রিলোকপতির মনে হইল, বিবাহ অনুষ্ঠানটা বিধাতার অভিপ্রায় অনুসারে ঘটে কিনা কেউ জানে না; কিন্তু ঐ অনুষ্ঠানটি যে মানুষের অত্যন্ত গভীর চিন্তার পরিণাম তাহাতে সন্দেহ নাই—কারণ ঐ উপায়ে দুর্দ্দান্ত অতি প্রখর বাস্তব একটা জন্তুর নগ্নতা ঘুচাইয়া তাহাকে সংযতশীল পথে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সেই মুক্তিদানের কোনো প্রকারান্তর নাই। কিন্তু পুরুষ নারীকে একেবারে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাহাকে অর্দ্ধাঙ্গে ব্যাপ্ত করিয়া লইয়া ভূমিষ্ঠ হইত

তবে কত যে খরচ বাঁচিত তার ইয়ত্তাই নাই—জীবনের কত সমস্যার উদ্ভবই হইত না—দুর্ভাবনায় মানুষ শুকাইয়া মরিত না—

ত্রিলোকপতি নিজের রসিকতায় একটু হাসিল।

কিন্তু তা' হয় না। পশুপক্ষীদের কি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় কে জানে! তাহাদের পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না নিশ্চয়, কেহ মন্ত্রপাঠ করায় না; কেবল মানুষই নিজেকে এই বিষয়ে নিতান্ত পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে। তার মানে আছে। মানুষকে আবদ্ধ করা হইয়াছে সত্য, অনেক দিক নিষিদ্ধ করাও হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে সাধুজনের পরম ঈপ্সিত একটা ক্ষেত্রে অশেষ অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে—সেই ক্ষেত্রটি সনাতন, নিষ্কলুষ···অধ্যাত্ম জাগরণ দ্বারা গ্লানি নির্ম্মুক্ত সেই ক্ষেত্রে দেহের মিলন হয়, এবং মিলন সার্থক হয়। ইহাই সেই পরাধীনতার মর্ম্মার্থ, পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য ঐখানে—কেবল সন্তান-সৃষ্টিই তার উদ্দেশ্য নয়, হইতে পারে না।

মেয়েটিকে পুরুষ আসিয়া বিবাহ করিয়া লইয়া যাইবে। নির্ব্বোধ ব্যক্তির হঠাৎ মনে হইতে পারে, মেয়েটির বিবাহের বয়স হইয়াছে, অতএব মন্ত্রশক্তির দ্বারা জীবনে জীবনে একটা অকাট্য গ্রন্থি দিবার অভিনয় করিয়া পুরুষটি মেয়েটিকে লইয়া যাইবে সন্তানার্থে, এবং সুলভে এমন সব হাস্যোদ্দীপক স্থূল কাজ করাইয়া লইবে যার নাম হইবে স্বামীসেবা এবং গৃহস্থালী। অনেকের ধারণা এই নিয়মেই, অর্থাৎ ধাপ্পাবাজির উপরেই জগৎ চলিতেছে।

ত্রিলোকপতি চাঁদের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। কি আশ্চর্য্য আজও কেহ কেহ মনে করেন, এই কুসংস্কার তাঁদের আছে যে, বিবাহ

আর কিছুই নয়, উভয় পক্ষেরই, অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষের, জীবনযাপন সম্বন্ধীয় একটি সুবিধাজনক চুক্তিমাত্র—বিবাহের অন্য অর্থ টানিয়া আনিয়া যদি কেহ ভাবোন্মত্ত হন তবে তিনি হইতে পারেন, কিন্তু ব্যাপার ঐ।—পুরুষের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়া স্ত্রী থাকিবেন পোষা, এবং উপযুক্ত ব্যবহার আর অন্নবস্ত্র না পাইলে স্ত্রী করিবেন গোঁসা। আবার কি চাই ?

গোঁসা করিবার অনুমতি স্ত্রীকে দেওয়া আছে।

ত্রিলোকপতি আবার একটু হাসিল—

ঐ ধৃষ্ট লোকগুলির প্রজ্ঞার ঐখানেই শেষ—তার বেশী অগ্রসর হইতে তারা শেখে নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা যায়, অনেকেই আছে ভাল, পরস্পরে মিলও আছে—স্বামীর প্রতি স্ত্রী এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামী অনুকম্পাসম্পন্ন।

তারপর ত্রিলোকপতির মনে হইল, বিবাহের এটা নিতান্তই ঘরোয়া, অপরিণত আর রূঢ় দিক্—স্থূল উদ্দেশ্যকে সার্থক করা মাত্র ; কিন্তু বিবাহের গভীর তাৎপর্য্যও রহিয়াছে—তাহার দিকে দৃষ্টি অধিকাংশেরই নাই, তবু তা' আছে।…স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলা হয়—মিথ্যা বলা হয় না ; স্বামী পতি ইহাও মিথ্যা নয় ; বিবাহকে দৈহিক সুখের আর স্বপ্ন-সুখের দ্বারোদ্‌ঘাটনের ব্যবহার করার মনোবৃত্তিই বেশীর ভাগ লোকের—ইহাও সত্য, কিন্তু তা একেবারেই ভুল—মানুষ ভারি ভুল করে, শোচনীয়ভাবে ঐখানটায় ভুল করিয়া সে বসিয়া আছে। বিবাহ ঐহিকও নয়, দৈহিকও নয়—বিবাহ পারত্রিক এবং আত্মিক। ইহা যে মানিতে না চায় সে উৎসন্নে গিয়াছে।

বিবাহের পরই নবদম্পতির চেহারার জৌলুস খুলিয়া যায় ইহা সবাই জানে। লোকে বলে, বিয়ের জলের গুণ। কিন্তু তা নয়। সত্তার গভীরতম সুখানুভূতির সঙ্গে তাহারা যে জগতে চক্ষুরুন্মীলন করে সেখানে আত্মাই কর্ত্তা, দেহ নয়—প্রকৃতি সুপ্তির শেষে সবগুলি দল উন্মোচিত করিয়া পূর্ণতম আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠে—ঐ শ্রী তাহারই, বিয়ের জলের নয়। উভয়ের গভীর অন্তরগত মিলন যেমন কামনাকে অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় করিয়া তোলে, তেম্নি দেহকে করে সুন্দর, মনকে করে পবিত্র, আত্মাকে করে অন্তর্মুখী। কাজেই দুজনারই চেহারা হয় এমন নবীন, যেন এক রাজ্য ছাড়িয়া অন্য রাজ্যে তাহারা নূতন করিয়া জন্ম নিল।...কেবল একটা লৌকিক স্থূল অনুষ্ঠানের পুনরাবর্ত্তন ঘটে—অন্তর্গত কোন নবতর পরিবর্ত্তন ঘটে না বলিয়াই দ্বিতীয় বার বিবাহের সম্মান নাই—শাস্ত্রেই তার মর্যাদা খুবই কম।

সংসারের যাবতীয় বিবাহিত ব্যক্তিকে এবং অন্যান্য অবুঝ লোকগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিলোকপতি অতঃপর গুরুদাসের সহোদরার কথা, তার ভবিষ্যতের কথা, চিন্তা করিতে লাগিল...

এ-বিবাহ নিশ্চয়ই হইবে—এবং ইহাদের বনিবনাও নিশ্চয়ই হইবে; সবারই হাতে কুমারীর হৃদয়-অমরাবতীর চাবি নাই, তবু মেয়েটি সুখী হইবে...সবারই নিঃশ্বাসে মুকুল চোখ মেলে না, তবু মেয়েটি সুখী নিশ্চয়ই হইবে।...বন্ধু গুরুদাসের সহোদরা বলিয়া ত্রিলোকপতি শিউলির সুখাকাঙ্ক্ষা করিতেছে এমন নয়—সুখ তাহার পক্ষে স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্য বলিয়াই ত্রিলোকপতির মনে হইতেছে।

গতিহারা জাহ্নবী

শুনা যায় পুরুষ নারীর প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন—নারীকে সে অবজ্ঞা করে...বর্ব্বর যুগে পুরুষ নারীকে ভয় করিত—তার মৃদুতা, কোমলতা এবং দুর্ব্বলতাকে ভয়ের চক্ষে দেখিত—সেই ভয় এখন অবজ্ঞায় রূপান্তরিত হইয়াছে। তখন ভয় করিত কিনা জানা যায় নাই, এখন যে অবজ্ঞা করে তাহাও অবিসম্বাদিত সত্য নহে। পৃথিবী অন্যায় উক্তি এবং গর্হিত আচরণের দ্বারাই মৌলিক এবং উন্নত হইয়া উঠিতেছে। আশ্চর্য্য!

আশ্চর্য্য হইয়াই ত্রিলোকপতি মেসের বাসায় পৌঁছিয়া গেল—জিজ্ঞাসা করিল,—ঠাকুর. ভাত হয়েছে?

—একটু দেরী আছে, বাবু।

—থাক্, একটু জিরুই। বলিয়া ত্রিলোকপতি ঠাকুরেরই খাটিয়ার উপর উঠানে বসিল...তখন তার মনে হইল, মেয়েটি বাড়ীর ভিতরেই মানুষ হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত বাড়ীর বাহিরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে নাই—জ্ঞান অল্প হওয়া সম্ভব; কিন্তু ঠিক্ ঐ কারণেই অন্য দিকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে বোধ হয়। আজকাল বিবাহের পবিত্র বন্ধনের মর্য্যাদা মেয়েদের তরফ হইতেই সর্ব্বত্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হইতেছে না—বন্ধন শিথিল করিয়া অনেকেই আনিতেছে—কেহ কেহ কাটিবার জন্য ছুরিও শানাইতেছে দেখা যায়। কোনো মেয়ে হয়তো শিক্ষায়তনের উচ্চ চূড়া হইতে অবতরণ করিয়া পাঁচ-সাত বৎসর কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছেন, নিজের অভীষ্ট সাধনের উপায় নিজেই আবিষ্কার করিয়াছেন জীবনের সুখোপকরণ নিজের জন্য নিজেই সংগ্রহ করিয়াছেন, নিজের রুচি অনুযায়ী অবসর যাপন করিয়াছেন, ইত্যাদি...হয়তো পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে নির্দ্দোষভাবে কিন্তু অবাধে মেলামেশা করিয়াছেন—

তাঁহাকে ধরুন বিবাহবন্ধন স্বীকার করিতে হইল—তারপর হঠাৎ একদিন ধরা পড়িল যে, তিনি ভুল করিয়াছেন—যাহা আশা কিংবা অনুমান করিয়াছিলেন ইহা তাহা নহে—কর্ম্মময় জীবনের বহির্মুখী অভিসারই ভাল ছিল; এখন যেন সবই উল্টাপাল্টা অস্বস্তিকর লাগিতেছে—মনের স্বাধীন স্ফূর্ত্তি ব্যাহত হইতেছে…

অথচ স্বামীকে তিনি ভালবাসেন; এবং ইহাও জানেন যে, চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটি ভয়ঙ্কর জিনিষ আছে—লোকে মনে করিতে পারে, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া একথা উঠিতে পারে যে পারিবারিক শৃঙ্খলা এবং শান্তি নষ্ট যে করে তার শিক্ষা নিষ্ফল, বুদ্ধি অল্প, মন দুর্ব্বল, নৈতিক জ্ঞান নাই…

কাজেই বিক্ষোভ একটা চলিতেই থাকে, কিন্তু ভিতরে; বাহিরে তার প্রকাশ হয় না। স্বামীকে ভালবাসেন বলিয়াই নিজের মনের অবস্থা তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহাকে আঘাত দিতে মহিলাটী চান্ না—অপ্রত্যাশিত দিকে তৎপরতা দেখাইয়া বিরোধের সৃষ্টি করিতে চান না—নিঃশব্দে তিনি একটা অসন্তোষের যন্ত্রণা বহন করেন। এরূপ অবস্থা অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়।

কিন্তু ইহাদের তেমন কিছু ঘটিবে না। মাকড়সা যেমন দেহাভ্যন্তরের তন্তু বাহির করিয়া জাল প্রস্তুত করে, ইহারা—শিউলি এবং তার স্বামী—নিজেদের অন্তরের সূক্ষ্ম সমুজ্জ্বল পরিবেশে শ্রী-অলঙ্কার-সমন্বিত করিয়া সসাগরা পৃথিবীব্যাপী একটি কাল্পনিক আবাস নির্ম্মাণ করিবে, যাহাকে কখনও মনে হইবে কুটীর, কখনও মনে হইবে প্রাসাদ, কখনও উপবন, কখনও সৈকত, কখনও উদ্যান, কখনও স্বর্গ, কখনও

অন্ধকার, কখনও আলোকিত—কিন্তু সর্ব্বদাই চমকপ্রদ এবং সুখদ…

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিল,—ভাত দেব, বাবু?

ত্রিলোকপতি বলিল—দাও।

আহারান্তে ত্রিলোকপতি একটি সিগারেট ধরাইল—বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া আর বালিশ লইয়া শুইল…চাঁদের আলো সমগ্র বারান্দায় পড়িয়াছে—ত্রয়োদশীর চাঁদ অত্যন্ত উজ্জ্বল।

শুইয়া শুইয়া ত্রিলোকপতির মনে হইতে লাগিল, রঘুনাথগঞ্জের ঐ বিশিষ্ট ভদ্রলোকটির পুত্রের সহিত শিউলির বিবাহ হইবেই—গুরুদাসের যেরূপ আগ্রহ দেখা গেল তাহাতে সে ক্ষতিকে ক্ষতি মনে না করিয়া এ-বিবাহ দিবেই; এবং আরো সস্তায় পাত্র কোথাও পাওয়া যায় কিনা তাহা সে অনুসন্ধান করিবে না।

কিন্তু ত্রিলোকপতি শিউলিকে দেখে নাই—সে আছে বলিয়াই ত্রিলোকপতি জানিত না। বরটি ত' একেবারেই অজ্ঞাত—তার নামই জানা নাই। কিন্তু তাহাতে ত্রিলোকপতির কিছুই অনিষ্ট ঘটিল না—সে অবলীলাক্রমে এখানকার শিউলির এবং রঘুনাথগঞ্জনিবাসী সেই যুবকটির অনুপম মূর্ত্তি কল্পনা করিল—পাশাপাশি স্থাপিত করিয়া নয়, পৃথক ভাবে। তার মনে হইল, গুরুদাসের সহোদরা শিউলি দেখিতে

ভালই—ভাল না হইয়া সে পারে না—তার চক্ষু দু'টী গভীর এবং বিমর্ষ; মনে হয় বিমর্ষ, কিন্তু বিমর্ষ তা' নয়, কারণ অন্তর বিমর্ষ নয়—আনন্দ সেখানে ছল্ ছল্ করিতেছে···তার চোখের ধরণই অম্‌নি—যেমন স্বচ্ছনীর সরসীকে বিমর্ষ মনে হইতে পারে, যদি যে দেখে তার দৃষ্টি গভীর মনে হয়। বর্ণ খুব গৌর নয়, কিন্তু অত্যন্ত উজ্জ্বল—এত উজ্জ্বল যে মনে হয়, তার ত্বকের চেতনা আছে—স্বতন্ত্র এমন একটা চেতনা যা' অপর চেতনাকে অভিভূত করে···তার কাছে গিয়া যে দাঁড়ায় তার মুখে-চোখে সেই ঔজ্জ্বল্যের সুপ্রসন্ন আভা পড়ে।...একটুখানি লম্বাটে গড়ন—পরিপূর্ণতায় আর পরিমাণ-পারিপাট্যে তার দেহের অনিন্দ্য আনন্দ-সুষমা যেন উৎসের মত ঝরিতেছে···গতিতে একটি মৃদু লীলা আছে, কিন্তু কথায় তাহাকে পারা ভার—ভারি কৌতুকপ্রিয়; ভাইপোগুলিকে অত্যন্ত জ্বালাতন করে- বৌদিকে ঠকাইবার দিকেও তার চেষ্টা আছে।—

কিন্তু সকলের চাইতে সুন্দর সে তখন যখন সে স্নান করিয়া ভিজা চুল পিঠের উপর ছাড়িয়া দেয়—তখনই সে অপূর্ব্বকুমারী আর স্বভাবকুমারী—সুকুমার আর ধৌত কুমারীদেহে জলকণা আর রোদের আভা ঝলমল করিতে থাকে—চোখের পাতা ভিজিয়া বড় করুণ দেখায়।···এমন একটি শিষ্টতা আর শালীনতা তার প্রত্যেক আচরণে আছে, যার জন্য তার বাড়ীর লোকের গর্ব্বিত হওয়া উচিত—

গুরুদাস নিশ্চয়ই গর্ব্বিত, নতুবা অত টাকা খরচ করিয়া অসাধারণ উৎকৃষ্ট পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দিতে বদ্ধপরিকর হইবে কেন!

কিন্তু সেই ছেলেটি ইহাকে কি প্রেমের চোখে দেখিবে। খুব প্রেমের

চক্ষে দেখিবে সন্দেহ নাই। ইহার লজ্জায়, ইহার সঙ্কোচে, ইহার রূপে, ইহার বাক্যে, ইহার হাসিতে, হার অভিমানে, ইহার গুণে—এক কথায়, ইহাকে পাইয়া, সে জীবনের স্বাদ পাইতে সুরু করিবে, এবং নিজেকে ধন্য মনে করিবে। ইহার অতি সরল অন্তঃকরণের আত্মদান হইবে অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী···আর, সেই ব্যক্তি, রঘুনাথগঞ্জের সেই যুবকটি, সব এবং সর্ব্বস্ব পাইয়াও অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিবে ঐ অন্তরের দিকে—সেই অন্তরের অপরিমেয় রহস্য হইবে তার চিন্তার বিষয় আর তৃষ্ণার আকর্ষণ—সে সন্দেহ করিবে, ঐ হৃদয় দূরবর্ত্তী নয়, একেবারে ঢালিয়া দিয়া সমর্পণ করিয়াছে, তবু ঐ হৃদয়েরই অন্তর্ব্বর্ত্তী কি একটা বস্তু সে যেন উদ্ঘাটিত করে নাই—সেই বস্তু পাইতেই হইবে···

এই আকাঙ্ক্ষায় সে শিউলিকে আরো ভালবাসিবে, আরো কাছে পাইতে চাহিবে, কিন্তু যথার্থ ভদ্র বলিয়া অসহিষ্ণু হইয়া চাহিবে, না।···কেবল গভীর চাহনির মাদকতা নয়, দেহের সুষমা, যৌবনের উদ্দামতা নয়, তাহাকে বন্দী করিবে শিউলির মনের লাবণ্য ..

মনের লাবণ্য বলিয়া একটা জিনিষকে কল্পনা করিয়াই ত্রিলোকপতির সন্দেহ হইল, মনের লাবণ্য বলিয়া কিছু আছে কি! আছে—যেমন আকাশের লাবণ্য, চাঁদের লাবণ্য, হরিৎক্ষেত্রের লাবণ্য, তটিনীর লাবণ্য আছে—তেমনি শিউলির মনেরও লাবণ্য আছে, আর তা' অসীম, আর তা' এক মুহূর্ত্ত লুকান' থাকিবে না—মানুষটি প্রতিমুহূর্ত্ত তা' দেখিতে পাইবে।···সুতরাং শিউলির সঙ্গ হইবে তার আত্মার অবগাহন, কল্পনার পরিমার্জ্জনা, আনন্দের অনুশীলন, বৈকুণ্ঠের সোপান···

চেতনাময় গভীরতার মাঝে তাহারা পরস্পরকে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে।

কিন্তু বরটি দেখিতে কেমন হইবে? কার্ত্তিকের মত! মনে হইতেই ত্রিলোকপতির হাসি পাইল। মানুষের কি রুচি দেখ! পরিকল্পনার কি বাহাদুরী! মানুষের রূপ কার্ত্তিকের মত!...কার্ত্তিকের কথা মনে পড়িলেই যে চেহারাটা আমরা দেখিতে পাই তাহা জড়-মূর্ত্তির—তাহাতে মানুষের মনের সে দীপ্তি কই! চোখে মুখে উদ্‌গ্রীবতা কই! জীবনের সদাচঞ্চল স্পন্দন কই! অথচ মানুষ কিনা কার্ত্তিকের মত! মানুষের মুখ যে মোহ আর তন্ময়তা সৃষ্টি করিতে পারে কার্ত্তিক তা' পারেন না। কার্ত্তিক যেন কর্ম্ম সমাপন করিয়া চিরদিনের জন্য বিশ্রামে বসিয়াছেন—অতএব তিনি বিগত... তাঁর অধর জিহ্বা চক্ষু ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া কাহারো প্রাণে নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি তোলে না—যেমন মানুষের বেলায় ঘটে...বিশেষ করিয়া এই ছেলেটির যেমন করে—যার সঙ্গে শিউলির বিবাহ হইবে তার যেমন করে। সুপুরুষ যাহাকে বলে সে তাই, আর সে অত্যন্ত প্রাণময়, আর সে শিউলিকে অত্যন্ত ভালবাসিবে।

এইখানে ত্রিলোকপতির অলস এবং অবিরাম চিন্তায় একটু ব্যাঘাত ঘটিল—

মেসের বাবুরা আসিয়া পড়িলেন...

ত্রিলোকপতিকে বারান্দায় নিশ্চেষ্ট অবস্থায় শায়িত দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্ত্রীলোকপতি খেয়েছ?

তাঁহারা ত্রিলোককে স্ত্রীলোক বলিয়া ডাকেন।

ত্রিলোকপতি বলিল,—খেয়েছি।

—আমরাও খাইগে। ঠাকুর ভাত দাও।···আজ কে হার্‌লে?

ত্রিলোক বলিল,—বাজি চটে' গেছে।

—তাই বুঝি চা'ল ভাব্‌ছ শু'য়ে শু'য়ে?

—হুঁ।

বাবুরা হাত মুখ ধুইতে গেলেন—

ত্রিলোকপতি তখন ভাবিতে লাগিল, ইহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে—অনায়াসে অবাধে ভালবাসিবে···সে ভালবাসায় তুলনা নাই···শুভ-দৃষ্টির সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে—সহজাত এবং সত্যজাগ্রত একটা ঐশী আকর্ষণ দুর্নিবার হইয়া তাহাদের সংযুক্ত করিয়া দিবে···এই আকর্ষণে স্বার্থের হাত আদৌ নাই—একই অবস্থায় নিপতিত দুইটি অসহায় ব্যক্তির মুখাপেক্ষিতা ইহা নহে—শাসিতের প্রতি শাসকের অনুকম্পা বা অনুগ্রহ নহে—মোহ নহে— বুদ্ধি খরচ করিয়া নহে—কেবল হৃদয়ের প্রেরণায় হৃদয় দিয়া তাহারা ভালবাসিবে···সত্য অমলিন সর্ব্বান্তঃকরণব্যাপী সেই ভালবাসা...যৌবনের উৎকণ্ঠিত কম্পমান চঞ্চল উষ্ণ রূপজ প্রেম নহে—ইহা সেই অভিজাত অনাদি প্রেমের স্রোত যাহা নিদ্রিত আদিম পিতা ঘুম ভাঙিয়া দেখিয়াছিলেন আদিম নারীর নিষ্পলক বিহ্বল আর অকপট চক্ষু দু'টিতে। মানুষের এই ভালবাসাই সংসারকে অলৌকিক করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া ত্রিলোকপতির মনে হইল···মানুষের জীবনে আর আছে কি! এই প্রেমই তার জীবন—জীবন বলিতে যাহা-কিছু বুঝায় তাহারই সমষ্টি এই প্রেম—জীবনে যাহা-কিছু উজ্জ্বল অপরূপ মনে হয় তাহা এই প্রেমরই প্রতিবিম্ব—যাহা কিছু উপভোগ্য মনে হয় তাহা

এই প্রেমের মিশ্রণেই হইয়া থাকে অর্থাৎ সংসারে বস্তু বলিয়া কিছু নাই প্রেম যাহাকে তার মর্ম্ম আর মধু দিয়া সৃষ্টি করে তাই কেবল আছে—আর সব মরীচিকা আর মায়া।···লোকে বলে, প্রণয়ী প্রণয়িণীর একজন ভালবাসে, আর একজন ভালবাসিতে দেয়। হয়তো এই সত্যই সাধারণ, কিন্তু তখনই পৃথিবীর পুনরাবর্ত্তন অভিনব, উৎসবময় আর রসাভিষিক্ত হইয়া চোখে পড়ে যখন দু'জনাই ভালবাসিতে দেয়। ইহারা তা-ই দিবে—শিউলি আর তার বর।

এইখানে ত্রিলোকপতি খচ করিয়া একটা যন্ত্রণা অনুভব করিল—যদি তা' না হয়!

কিন্তু না, তাহা হইবে না, হইতে পারে না—কারণ, দেবতা নির্ম্মম নহেন।

সুখের ইতিহাস নাই—প্রেমেরও ইতিহাস নাই, কারণ তার উত্থান-পতন, ভাগ্যবিপর্য্যয়, আদি মধ্য অন্ত নাই। ইহাদের ভালবাসার ইতিহাস কেবল এইটুকু যে তাহারা ভালবাসে।

ত্রিলোকপতি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত অনুভব করিল যে, ইহাদের প্রেমে কলুষ থাকিবে না, কারণ কলুষ অপ্রসন্ন, আর জ্বালাময় ধ্বংস তার ভাগ্যে ঘটে···দ্বিতীয়তঃ, কলুষের তীব্র একটা উদ্দীপনা আছে—সেই উদ্দীপনা বেদনা বহন করে আর অবসাদ আনে। এ দুর্ভাগ্য ইহাদের ঘটিবে না; ইহারা ভালবাসিবে আর মনে করিবে, আত্মার মণিকোঠায় বসিয়া দেবতা স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিতেছেন···ইহারা এ কথাটাও ভুলিবে না যে, প্রেম অর্জ্জন করা মানেই প্রেমের অনশ্বরত্ব উপলব্ধি করা।

তারপর, ইহাদের কি বিরহ ঘটিবে না? নিশ্চয়ই ঘটিবে—সংসারীর পক্ষে তা' অনিবার্য্য, না ঘটান চলে না। বিরহের গভীর আর্ত্ততা তাহাদের চোখে ফুটিবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে—ত্রিলোকপতি স্পষ্টই অনুভব করিল, এই আর্ত্ততার সঙ্গে সঙ্গে, তাহারা যে সুখ অনুভব করিবে তার সীমা-পরিসীমা নাই···তখন একটি অনাহত মধ্যাহ্নের উদয় হইবে—তাহার আলোকে তাহারা দেখিবে, অন্তরের দিগন্ত পর্য্যন্ত অত্যন্ত উজ্জ্বল—সেই উজ্জ্বলতাকে মহিমায় মণ্ডিত আর সৌন্দর্য্যে পুলকিত করিয়া বিরাজ করিতেছে একটি মাত্র মূর্ত্তি সেই মূর্ত্তি·শিউলির বেলায় হইবে সেই ছেলেটির এবং সেই ছেলেটির বেলায় হইবে শিউলির। তাহারা তখন অধিকতর তদ্গতচিত্ত এবং অভিভূত হইয়া যাইবে।···তারপর তাহারা পুনর্ম্মিলনের জন্য উন্মত্ততা নয়, উন্মত্ততা অশোভন তাহা তাহারা জানে, তাহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিবে···এবং পুনর্ম্মিলন অম্‌নি ঘটিবে না—হর্ষে প্লাবিত হইয়া তাহারা বন্যার বেগে ছুটিয়া আসিয়া একত্রিত হইবে।

কিন্তু বড়ই মুস্কিল বটে, মানুষ পরের মন বিশ্লেষণ করিতে বসে—নিঃসংশয় হইয়াও অনুসন্ধান করিতে চায়···বিচারকরিতে অগ্রসর হয় যে, যাহা সে দিয়াছে তাহার প্রতিদানে সে ষোল আনাই পাইয়াছে কি না। কিন্তু ইহাদের সে মতি হইবে না—কারণ, ইহারা সরল আর স্বাভাবিক আর শিক্ষিত। ইহারা জুয়াচুরি করে না, ইহাদের আত্মগোপনে রুচি নাই···পরের অন্তরের প্রতিবিম্ব নিজের ভিতর দেখিয়া ইহারা মনে করে না, সেটা নিজেরই চোখের ভুল—আত্ম বলিয়া কিছুই সে দান করে নাই। এম্‌নি যদি কেহ মনে করে তখন সে

নিজেকে মনে করে বন্দী—বন্দীত্বের ভিতর হইতে তখন সে পলায়ন করিতে চায়—কিন্তু তাহা সত্য কেবল কৃত্রিম বিনিময়ের পক্ষে—ইহাদের প্রেমে কৃত্রিমতা নাই···যাচাই করিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র করিতে ইহারা জানে না।···সুতরাং ইহারা অমর।

মানুষের প্রেমের ট্র্যাজিডি মৃত্যুতে নয়, বিরহে নয়, অবসাদে আর ক্ষুদ্রতার পরিচয়ে, আর উদাসীনতায়।

ত্রিলোকপতি মনে মনে একটু বক্র হাসি হাসিল—নিজেরই উদ্দেশে...

খারাপ হাল্কা আয়নার ভিতর ছায়া যেমন বিকৃত অদ্ভুত দেখায় এও তেমনি, অর্থাৎ তাহার নিজের মন অতিশয় ক্রুর বলিয়া প্রেমের এই অসম্ভব বিকৃতির কথা সে ভাবিতেছে।

সে যাহা হউক, যে স্থানে ইহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে সে-স্থান হইবে তীর্থতুল্য···সে স্থানটী কি এবং কেমন তাহা ত্রিলোকপতি আগেই ভাবিয়া রাখিয়াছে—সে-স্থানটী তাহাদের হৃদয়ের রাসমন্দির—এই স্থানের অনন্ত রূপান্তর কেবল তাহাদেরই কেন্দ্র করিয়া আসিবে, যাইবে এবং আবর্ত্তিত হইবে। ঐ স্থানটা মানুষের চোখে পড়িবে না কিন্তু মনে জাগিবে—নির্নিমেষ অপলক হইয়া জাগিবে···মানুষের শ্রদ্ধার প্রণিপাতের স্পর্শে তাহাদের প্রেমের ঐতিহ্যের সৃষ্টি হইয়া সে-স্থান হইবে অক্ষয়, আর চিরবরণীয়···ধ্যানে মাত্র উপলব্ধি করার মত একটা অশরীরী মন্দির সেখানে গড়িয়া উঠিবে...জগদতীত মূল্য তার মানুষে বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না—কেবল স্মরণ করিয়া অপার্থিব রসসিঞ্চনে ধন্য হইয়া যাইবে···

উচ্চারণ করিবে, এখানে ভালবাসা জন্মিয়াছিল, স্থিতিলাভ করিয়াছিল, কিন্তু বিলুপ্ত হয় নাই—সুন্দরের মর্ম্মে আর প্রকৃতির বক্ষ-কুহরে তাহা সঞ্চিত হইয়া আছে...

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ইহাই।

এই তীর্থ আবিষ্কারের পর ত্রিলোকপতি অতিশয় মুগ্ধ হইয়া শয়ন করিতে গেল···সকাল বেলা ঘুম ভাঙিয়া দেখিল, চির-আকাঙ্ক্ষিত আরাধ্য বস্তুকে লাভ করিয়া মনটা যেন গ্লানিহীন পরম তৃপ্তির মাঝে ডুবিয়া আছে।

বৈকালে গুরুদাস বলিল,—বুড়ো ভারি ঠ্যাটা হে—কিছুতেই বাগ মান্‌তে চায় না—কিছুতেই কমালে না। কি করি, তাতেই রাজি হয়েছি। ৭ই বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে।

ত্রিলোকপতি বলিল,—বাঁচলাম।

ত্রিলোকপতির ভয় হইয়াছিল পাছে এই সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায়! কিন্তু গুরুদাসের মনে হইল, ত্রিলোকপতি ঠাট্টা করিল···তাহার কি দায় যে শিউলির বিবাহের দিন স্থির হওয়ায় সে বাঁচিয়া গেল!

কিন্তু ইহা সে জানে না যে, ত্রিলোকপতি এই বিবাহ হইবেই মনে করিয়া কত মাথা ঘামাইয়াছে, আর হওয়াটা দেখিবার জন্য সে কত উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। এই বিবাহটি নিষ্পন্ন হইলেই ত্রিলোকপতির তীর্থ-যাত্রা সার্থক হইবে—যদিও তীর্থটি অবস্থান করিতেছে নিতান্তই তার মস্তিষ্কে।

৭ই তারিখ শীঘ্রই আসিয়া পড়িল।

ত্রিলোকপতি বাজার টানিল, সামিয়ানা খাটাইল, সামিয়ানার-বাঁশ ভাঙিয়া আছাড় খাইল এবং আরও কত কাণ্ড করিল তাহার হিসাব নাই।···বরযাত্রীগণ আসিবার পূর্ব্বে যে গোলমাল আর খাটুনি আর ব্যতিব্যস্ততা ছিল, তাহারা আসিবার পর তাহা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল··· সবাই পরিশ্রম করিতেছে, কিন্তু দেখা গেল, ত্রিলোকপতি করিতেছে সকলের চতুর্গুণ।

মশলা-পেষা শিল নোড়া ধোয়া হইতে জনৈক বরযাত্রীর জন্য সেতার সংগ্রহ সে-ই করিল···বরযাত্রীদের জল পান তামাক চা দিল...বরকে বাতাস করিল...

বরের বাবা সেই বিশিষ্ট ভদ্রলোকটিকে করযোড়ে নমস্কার করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—ভাল ছিলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার খবর ভাল ?

কিন্তু জবাব দিবার সময় ত্রিলোকপতি পাইল না—

কে একজন চায়ে আরো খানিক চিনি চাহিলেন—ত্রিলোকপতি চিনি আনিতে দৌড়াইল।

ত্রিলোকপতি উঠান ঝাঁট দিল, পাতা করিল, জল দিল, ইত্যাদি সে না করিল কি! সে মানুষকে খাওয়াইল, সমাদর করিল, যত্ন করিল, উৎসাহিত করিল, আপ্যায়িত করিল—একটা ভৃত্য গুরুদাসের ধমক খাইয়া রাগ করিয়াছিল—ত্রিলোকপতি হাতে ধরিয়া তার রাগ ভাঙাইল।

প্রীতি-উপহার বিতরণও সে-ই করিল—এবং সম্প্রদানের পর বর-

কন্যা বাসরঘরে গেলে ত্রিলোকপতি খালি একটি রসগোল্লা মুখে দিয়া এক গ্লাস দধি পান করিল...

কৃতজ্ঞ গুরুদাস উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিল,—আর কিছু খাবে না?

—না। খিদে নাই।

—অত' ঘাঁটাঘাঁটির পর খেতে রুচি নেই, কেমন?

—তা-ই।

—বর কেমন দেখলে?

—চমৎকার, চমৎকার, চমৎকার। বলিয়া ত্রিলোকপতি তার তীর্থের দিকে চাহিল...মনে হইল, কিছুই ভুল করি নাই।

গুরুদাস বলিল,—শিউলির সঙ্গে মানিয়েছে বেশ:

—আমি তা' জান্‌তাম।

—হিতৈষী তুমি, খুশী ত' হবেই।

ত্রিলোকপতি বলিল,—আসি এখন।

—এস। ভারি খেটেছ। আচ্ছা, এর পুরস্কার তুমি পাবে। বলিয়া গুরুদাস পুলকিত কণ্ঠে হাসিতে লাগিল।

ত্রিলোকপতি তার মেসের বাসার দিকে চলিতে লাগিল—কিন্তু এত ক্লান্তির পরও যেন পথ দিয়া নয়, আকাশ দিয়া···চরিতার্থ হইয়া তার মনে হইতে লাগিল আমিই পথ করিয়া দিলাম।

নিত্যধন চাটুয্যের অপরাধ

কি একটা উপলক্ষ্যে সহদেব সেন ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন করিতেছে...

"খাওয়ায় স'দেব সেন"—এই খ্যাতিটা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়, সহদেব সেন সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া আয়োজন করিতেছে, ইহাও শুনা গেল; আরো শুনা গেল যে, দিনটাও ঠিক হইয়া আছে।

আয়োজন যথাযোগ্য, রীতিমত—কেহ কেহ বলিল, "অভূতপূর্ব।"

শুনিয়া ভূদেবগণের রসনা চঞ্চল হইয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে ভট্টাচার্য্যের পথে সাক্ষাৎ হইয়া যাইতেই উভয়েই দাঁড়াইয়া গেলেন...

সহদেবই তখন সম্মুখে উজ্জ্বলতম—

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—শুনেছ হে, সহদেব খাওয়াবে!

শোনা কথাই; তবু পুনরায় শুনিয়া ভট্টাচার্য্যের মুখ উৎফুল্ল হইয়া রহিল...বলিলেন, শুনেছি। তুমি শুন্‌লে কার কাছে?

—কাগের মুখে।...তোমার সন্দেহ আছে না কি?

—বিন্দুমাত্র না।

—বাবা বাঁচলাম। কতদিন যে পেট ভরে' ভোজ খাইনে তা' মনেও পড়ে না।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—পেট ভরে' খাওয়াতে আর কে জানে! রয়েছে ত' অনেকেই!

—ঘোষালে আর আমাতে সেই কথাই বল্‌ছিলাম তখন; খাওয়ানোটা উঠে যাচ্ছে দিন দিন।…ভেতরের খবর কিছু রাখ নাকি আয়োজনের? শুন্‌ছি, বিরাট ব্যাপার!

—ক্রমশঃ প্রকাশ্য। এখনও ত' দিন সাতেক দেরী আছে। বলিয়া ভট্টাচার্য্য পা বাড়াইলেন…

এবং পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া যে-হাসি হাসিয়া তাঁরা যে-যার পথে গেলেন সে হাসি কেবল সরস রসনার গুণেই চিত্তহারী।

সময় যত যায় গুজব তত জোরাল' আর ঘোরাল' আর রসাল' হইয়া উঠে…

শুনিতে শুনিতে আর ভাবিতে ভাবিতে চারু ঘোষালের হঠাৎ এক সময় একটা বেগ আসিয়া গেল…তিনি আসিয়া বিশ্বসুখ সান্ন্যালকে ডাকিয়া ডাকিয়া অন্তঃপুরের বাহিরে আনিলেন—হাসি মুখে বলিলেন,—শুনেছ হে সহদেবের কারখানাটা? না, বাড়ীর ভেতরেই চুপ্‌চাপ্‌ বসে আছ?

অতুলনীয় যে ব্যাপার প্রায় অভাবনীয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে তাহার কথা মুখে বলা যায় কত? সুতরাং প্রশ্ন করিয়া চারু ঘোষাল বিশ্বসুখের মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন…

কিন্তু বিশ্বসুখ বাড়ীর ভিতর গামছা পরিয়া শাক-ক্ষেতের মাটি

প্রস্তুত করিতেছিলেন, আনন্দের বার্ত্তাবহ ঘোষালকে তাঁর উৎপাত মনে হইল···মাটিমাখা হাতের দিকে চাহিয়া তিনি বিরক্তমুখে বলিলেন,—কে অত খবর রাখে...

ঘোষালের উদ্যম নিবিয়া গেল।

—এঃ, বিরক্ত দেখ্‌ছি যে বড়। তবে থাক্‌। বলিয়া ঘোষাল আন্তরিক ক্লেশ পাইয়া সেখান হইতে ফিরিলেন।···কিন্তু মানুষ মাটিতে পড়িয়া মাটি ধরিয়াই ওঠে। ঘোষাল দৌড়াইয়া আসিয়া যাদব চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় উঠিলেন—

বলিলেন,—শুনেছ, চক্কোত্তি, তোমাদের বিশ্বসুখ সান্ন্যাল আমাদের আর মানুষ মনে করে না?

যাদবের হাতে কাজ ছিল না, কেবল ধূমপান করিতেছিলেন; বলিলেন, বলো, কি হয়েছে বলো।

মর্ম্মাহত ঘোষাল তখনই বসিলেন না, বলিলেন,—মোকদ্দমায় জিতে এখন মানুষকে যেন শিঙে তুলে' আছড়াতে চায়!

ঘোষালের রাগ দেখিয়া চক্রবর্ত্তী ঠাণ্ডা সুরে বলিলেন,—বস'; তামাক খাও।···শুন্‌ছি।

ঘোষাল বসিলেন; বলিলেন,—তামাকের কথায় মনে পড়ে' গেল—সহদেব নাকি দু'টিন তামাক খাস্‌ গয়া থেকে আনাবে!

—সে ত' সেই দিনটা কেবল। তা' বলে' আজকে এ তামাকে অরুচি করো না।

—না, তা' করিনি'। আমাদের এ তামাকই বা নিন্দের কিসের?

—সান্ন্যালের কথা কি বল্‌ছিলে?...নাও।

হুঁকা লইয়া ঘোষাল বলিলেন,—একটু তোয়াজ করে' তাকে বল্‌তে গেলাম, শুনেছ হে সহদেবের কারখানাটা' ?…এ-সব কথা নিয়ে মানুষ একটু আনন্দ করতেই চায়; কিন্তু সে শুনে তেড়ে' উঠল—যেন আমি তার কিই-না করেছি! বলিয়া নির্য্যাতিত ঘোষাল একটু ক্লেশের হাসি হাসিয়া আরও বিষন্ন হইয়া গেলেন।

—যাক্ গে সে-কথা। কি এমন খবর নিয়ে গিয়েছিলে শুনি?

—ঐ খবরেরই খবর, আজকাল যা চল্‌তি। শুন্‌লাম দই আস্‌ছে জিয়াগঞ্জ থেকে; ছুরিতে করে' কেটে' কেটে' চাপ্ চাপ্ পাতে দেবে।

বলিয়া ঘোষাল লক্ষ্য করিলেন যে, খবর শুনিয়া চক্রবর্ত্তী বিন্দুমাত্র বিচলিত হন্ নাই…মৃদু হাসিয়া চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিলেন,—আর কিছু খবর রাখো?

—কই, আর কিছু ত শুনিনি আপাততঃ। বলিয়া ঘোষাল মনে মনে হতাশ হইয়া গেলেন…চক্রবর্ত্তীর ভাব দেখিয়া তাঁর মনে হইল, যেন তাঁর আগেই আরো জবর খবর সংগ্রহ করিয়া মজবুত হইয়া বসিয়া আছে!

ঘোষালের অনুমান ঠিক—

যাদব চক্রবর্ত্তী দু'টি আঙুল তুলিলেন, তর্জ্জনী আর মধ্যমাটি; বলিলেন—মাত্র দু'-আনা খবর তুমি জানো—আনা বারো আমার কাছে শোনো…

—আর দু' আনা?

—ব্যাকুল হ'য়ো না…আর দু' আনা কা'ল এসে শুনে' যে'ও।

—বারো আনাই বলো শুনি।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন —শোনো। জেলা যশোরের অধীন তপাগাছির বিল থেকে আস্‌ছে কৈ মাছ—যশোরের প্রসিদ্ধ কৈ...তার প্রত্যেকের পেটটাই এক বিঘৎ। বলিয়া এক বিঘৎ বলিতে কতটা স্থান বুঝায়, তর্জ্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা পরস্পর হইতে দূরে লইয়া চক্রবর্ত্তী তাহা দেখাইলেন; তারপর বলিলেন —দু'টো ক'রে এই মাছ ফি ব্রাহ্মণে পাবে; দু'টো ভাজা, দু'টো সর্ষে-পাতুড়ী...

বলিয়া থামিতেই ঘোষাল জিজ্ঞাসা করিলেন—আর দু'টো?

—বোধ হয় ঝোলে। সেই কৈ মাছের পেটের তেলে বড়া হবে।

মুখ তিক্ত করিয়া ঘোষাল বলিলেন—তেলের বড়া প্রায়ই তিতো হয়।

—খে'ও না; কেবল মাছই খে'ও।

—আচ্ছা, ওদিকটা নিশ্চিন্দি···তারপর?

—তারপর ত' বিস্তর; কিন্তু খেতে হ'বে যেমন একটির পর একটি, সবুর স'য়ে স'য়ে—শুন্‌তেও হবে তাই।···তারপর গল্‌দা চিংড়ী দেড় মণ; রুই—

—দেড় মণ হ'লে ক'টি করে' পড়ে?

—ফি ব্রাহ্মণের? সে হিসেব ক'রে ওরাই তখন দেবে।

—প্রচুর আস্‌ছে। গাদার মাছ ব্রাহ্মণের পাতে পড়বে না—যত পারো পেটিই কেবল।

—বল কি!···বলিয়া খানিক দম্ লইয়া ঘোষাল জিজ্ঞাসা

করিলেন,—ওদিক্‌কার খবর ত' একরকম শোনা হ'ল...এদিকে ভাত, না লুচি?

ঘোষালের এই অর্ব্বাচীন প্রশ্নে চক্রবর্ত্তী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; বলিলেন,—সহদেব কখনো সাদা ভাত ব্রাহ্মণকে খাইয়েছে! আর, লুচি হ'লে কি মাছের অত যোগাড় করে!...বড় দমিয়ে দিলে তুমি! কিসের সঙ্গে কি খাটে তাই জানো না ভাল ক'রে—তুমি গিয়েছিলে বিশ্বসুখ সান্ন্যালকে খবর দিতে!...এ-বিষয়ে কাউকে খবর দিতে যাবার আগে আমার কাছে একটু বসে যে'ও—ঠক্‌তে হবে না।

চক্রবর্ত্তীর ঐ কথাগুলি ধমক্ নয়, বিদ্রূপ নয়, প্রীতি—

চক্রবর্ত্তীর বন্ধুপ্রীতিতে হৃষ্ট হইয়া ঘোষাল হাসিতে লাগিলেন... বলিলেন,—ভাতও নয়, লুচিও নয়; তবে কি পোলাও?

—হ্যাঁ। ঘি যাচাই করা লেগে গেছে। মুর্শিদাবাদ থেকে দর—.

—নমুনো এসেছে।

চক্রবর্ত্তী নিঃশব্দ হইলেন—

এই ধারণাতীত অনুষ্ঠানের সম্মুখে ঘোষালেরও রা সরিল না— খানিক্ নিঃশব্দ থাকিয়া তিনি উঠিলেন।

কিন্তু কথার শেষ তখনও আসে নাই—

ঘোষাল উঠিয়া যাইতেই চক্রবর্ত্তীর ব্রাহ্মণী হরিভাবিনী অন্তরাল ত্যাগ করিয়া স্বামীর সম্মুখে আসিলেন; এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া বলিলেন,—কেউ এসে পড়বে না ত'?

—না। কি আরজ তোমার?

হরিভাবিনী বলিলেন,—তোমাদের ঘোষালের গলা শুনে এসে

দাঁড়িয়েছিলাম।...তোমাদের ত' কবে থেকেই জিব্ দিয়ে জল ঝর্‌ছে ; খবর রেখে বেড়াচ্ছ ; আলোচনা আর আনাগোনার অন্ত নেই।... মেয়েদেরও বল্‌বে কি না সে খবর রাখ না ?

চক্রবর্ত্তীর পাঁচ বছরের মেয়ে উমাতারা বলিল,—বাবা, আমিও যাব ভোজ খেতে তোমার সঙ্গে।

চক্রবর্ত্তী কন্যার চিবুকে আঙুল ছুঁইয়া আদর করিলেন ; বলিলেন,—যাবে বৈ কি।

উমা বলিল,—খেয়ে পেট এম্‌নি ডাগর হবে, নয় বাবা ? বলিয়া পেট কাঁপাইয়া আর পেটের খানিক উর্দ্ধে শূন্যে হাত তুলিয়া ডাগর পেটের যে আয়তন উমা দেখাইল তাহা অসম্ভব।

—হুঁ। বলিয়া চক্রবর্ত্তী বিপুল উদ্যমে হাসিতে লাগিলেন।

হরিভাবিনী বলিলেন,—আমার কথার কি হ'ল ?

—খবর নিচ্ছি দাঁড়াও।

—দাঁড়িয়ে ত' আছিই ; কিন্তু খবর নিতে তোমার বয়ে গেছে।

—না, নেব ; তদ্বিরও ক'রব, যাতে আর কারো না হোক্, আমার সস্ত্রীক নেমন্তন্ন হয়।

—তা' আবার করতে যাবে তুমি ! স্তোক্ বাক্য বল্‌ছ এখন—আমি চলে গেলেই তোমার কিছু মনে থাক্‌বে না।

চক্রবর্ত্তী প্রতিশ্রুতি দিলেন,—না, থাক্‌বে।

হরিভাবিনী প্রথমে স্তোক্ বাক্য বলিয়া স্বামীর কথায় উপেক্ষার ভাণ করিলেও দ্বিতীয়বার প্রতিশ্রুতি পাইয়া যথার্থই আশান্বিতা হইয়া প্রস্থান করিলেন।

উমা মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছিল—হাঁটু বাজাইয়া আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম সুরে সে গাহিতে লাগিল,—মা যাবে, বাবা যাবে, আমি যাব…

সেইদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে চক্রবর্ত্তী হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন,—আঃ হা, বল্‌তে ভুলে গেলাম…যা ত' উমা, তোর মাকে বল্ গিয়ে, আমার একখানা কাপড় যেন সাবানে কেচে রাখে।

পরদিন একটা আন্‌কোরা সুসমাচার লইয়া চারু ঘোষাল স্ফীত চিত্তে যাদব চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় পৌছিয়া দেখিলেন, সেখানে আরো অনেকে সমবেত হইয়াছেন, কিন্তু ঘোষালকে দেখিয়াই তাঁহারা যেন চল্‌তি একটা কথা হঠাৎ চাপা দিয়া একটু জড়সড় হইয়া গেলেন—আর তা' স্পষ্ট হইয়া ঘোষালের চোখের উপরেই ঘটিল…

বাড়ী চক্রবর্ত্তীর, তিনি অভ্যর্থনা করিলেন,—এস, ঘোষাল, বস।' নতুন খবর কি ওদিক্‌কার?

ঘোষাল একবার সকলের মুখের দিকে চাহিলেন; তারপর বলিলেন, —খবর ত' ছিল; কিন্তু তোমাদের ভাব দেখে' খবর দিতে আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে না।

শুনিয়া কেহ কাহারো দিকে না চাহিয়া প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে একটু হাসিলেন—ষড়যন্ত্র সফল হইয়াছে।

ঘোষাল পুনরায় বলিলেন,—আমি কিন্তু এঁচেছি কতক…

ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—ছাই এঁচেছ।…খবর কি বলো দেখি

আমাদের কাছেও এত খবর মজুত রয়েছে।···বলিয়া তিনি দক্ষিণ হস্ত তরঙ্গের গতিতে চালিত করিয়া উলটান' ধামার মত সুবৃহৎ একটি আধার কল্পনা করিলেন।

অবনত মুখ তুলিয়া মন্‌-মরা ঘোষাল বলিলেন,—শুন্‌লাম, কল্‌কাতা থেকে কাঁকড়া আর ভেট্‌কী মাছও আস্‌ছে।

···তুমি চিরদিন পিছিয়ে রয়ে গেলে। বহুৎ পুরাণো খবর—আমরা এ খবর শুনেছি প্রায় আঠার ঘণ্টা হ'ল। বলিয়া চক্রবর্ত্তী অট্ট-হাস্যকরতঃ নিমচাঁদ গোস্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আঠার ঘণ্টাই, কি বল?

গোস্বামী বলিলেন,—তার কিছু বেশী বই কম হবে না।

পুরাতন সংবাদ আনয়ন করিবার লজ্জায় ঘোষাল মরমে মরিয়া গেলেন।

যেমন করিয়া ছেলেরা ধাঁধার উত্তর জিজ্ঞাসা করে তেম্‌নি করিয়া বিনায়ক মুখুজ্জে প্রশ্ন করিলেন,—বল দেখি, ঘোষাল, কাঁকড়া আর ভেট্‌কী যদি জুৎমত না মেলে তবে কি কর্‌বে সহদেব?

ঘোষাল উত্তরটা জানিতেন না; অজ্ঞতার দরুণ নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া বলিলেন,—তা' ত' জানিনে।

—তবে কিসের বাহাদুরী তোমার! সকল খবরের চেয়ে টাট্‌কা খবর যেটা সেইটাই তোমার জানা নেই।···যদি কল্‌কাতার বাজারে দৈবাৎ কাঁকড়া আর ভেট্‌কী না মেলে তবে গোয়ালন্দ থেকে—

নির্ব্বাপিত ঘোষাল চোখ মুখ উজ্জ্বল করিয়া মুখুজ্জের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া লাফাইয়া উঠিলেন—ইলিশ!···ঈশ্বর করুন, ক'ল্‌কাতার

ভেট্‌কী আর কাঁকড়া মাছের বাজার যেন পুড়ে যায়।…ভেট্‌কী আর কাঁকড়া কি আর মাছ! জলের পোকা। বলিয়া ঘোষাল কাঁকড়া আর ভেট্‌কীর প্রতি ঘৃণাবশতঃ নিম্নৌষ্ঠকে দিয়া উর্দ্ধৌষ্ঠকে নাসিকার দিকে ঠেলিয়া তুলিলেন…

গোসাঁই শুধাইলেন,—বল দেখি, ঘোষাল, ঘি মুনাসিফ্ হয়েছে কোথাকার?

—মুর্শিদাবাদের।

এবার ঘোষালের উত্তর নির্ভুল হইয়াছে।

—আনারস আর আম আস্‌ছে কিনা?

—আস্‌ছে।

নিমন্ত্রিতের ফর্দ্দ প্রস্তুত হয়েছে কিনা?—প্রশ্ন করিয়াই গোসাঁই সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া সঙ্গীহারার মত যেন খানিক গুটাইয়া গেলেন…

ঘোষাল থতমত খাইয়া বলিলেন,—হয়েছে শুনেছি।

ঘোষালের উত্তর এবারও নির্ভুল—

কিন্তু তারপরই সবাই নীরব হইয়া রহিলেন, যেন একটা বেদন পরিপাক করিতে হইতেছে…

ফর্দ্দ প্রস্তুতের প্রশ্নের পরই হঠাৎ এই নীরবতার একটা নিদারুণ অর্থ অব্যর্থ বিপুল বেগে ঘোষালের বুকে বাজিয়া উঠিল…একদৃষ্টে মাটির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যেন কান্না চাপিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—ফর্দ্দে বুঝি আমার নাম নেই?

কেহ জবাব দিলেন না—

মুখুজ্জে চক্রবর্ত্তীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—ভীম নাগ,

শুন্‌লাম,—অর্ডার নেয় নি, তস্য ভ্রাতা শ্রীনাথ নাগ নিয়েছে।...ভা-ই সমান—এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্।

যে যাহাকেই দেখুক, আপাততঃ ঘোষালের তাহাতে কি যায় আসে না।...তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন—

গোসাঁই ভুরু তুলিয়া জানিতে চাহিলেন,—লড়তে যাচ্ছ না কি!

—যাচ্ছি বই কি! কে তাকে পরামর্শ দিয়েছে শুনে' আ'।। আমার চেয়ে ব্রাহ্মণের খাঁটি রক্ত কার বেশী আছে বলে' সে জানে তাও শুধিয়ে আসি।—বলিয়া ক্রুদ্ধ ঘোষাল ত্বরিতপদে উঠানে নামিলেন...

উমার বাবা যাদব চক্রবর্ত্তী তাঁর পশ্চাতে হাঁকিয়া বলিলেন,—মেয়েদেরও নেমন্তন্ন হবে কিনা সে খবরটাও অম্‌নি নিয়ে এস।

কিন্তু সংবাদটা বানানো—

ঘোষালকে ক্ষ্যাপানো মাত্র—

সহদেব হাসিয়া বলিল,—রামঃ, আপনাকে বাদ!...এই দেখুন, ফর্দ্দে আপনার নাম তৃতীয় স্থান অধিকার করে' আছে।

*

* *

আজ সেই বহু আলোচিত ও প্রতীক্ষিত ভোজ।

উঠানের চারি প্রান্ত জুড়িয়া সামিয়ানা খাটান' হইয়াছে; সামিয়ানার কেন্দ্রস্থলে শালুর রক্তপদ্ম সেলাই-করা; চারিকোণে তিনটি করিয়া গোলাপের পাতা—ঐ শালুর, আর সেলাই করা। মাটিতে কি যেন ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে—একটা মৃদু সুঘ্রাণ উঠিতেছে। বিন্দুমাত্র অপরিচ্ছন্নতার ভাব কোথাও নাই।

সহদেব সেন কদলীপত্রে আর মেটে গেলাসে ব্রাহ্মণভোজন করায় না; আর পাতের উপর ভাত তরকারী স্তূপীকৃত করিয়া দিয়া, আর ডাল ঝোল টক্ চাট্‌নী ভাজা স্বক্তো দই ক্ষীর বেপরোয়া ঢালিয়া দিয়া বারমিশেলী কটু আস্বাদ আর ভোজনকারীর নিগ্রহের একশেষ করে না—

প্রত্যেক ব্রাহ্মণের জন্যই কাংস্য পাত্রের বন্দোবস্ত—থালা বাটি গেলাস রেকাবী যত লাগে।...যেটা ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, রেকাবীর উপর হইতে, কি বাটীর ভিতর হইতে আঙুলে করিয়া এতটুকু তুলিয়া, কি অঞ্জলি ভরিয়া তুলিয়া, কিম্বা সুবিধা বুঝিলে চুমুক দিয়াই খাও—

পরিবেশনকারী সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘামিতেছে দেখিয়া, আর মনে মনে তাড়না করিতেছে বুঝিয়া, বিব্রত বোধ করিতে হইবে না... তাড়াতাড়ি নাই—না চিবাইয়া গ্রাস নামাইতে হইবে না...

এক কথায়, নিশ্চিন্ত তৃপ্তির চূড়ান্ত।

প্রত্যেকের জন্য সুগঠিত মসৃণ কাষ্ঠাসন—

ব্রাহ্মণগণ দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলেন—যেন ময়দানব স্বয়ং আসিয়া সভা সাজাইয়াছে...এতগুলি কণ্ঠে না হোক্, এতগুলি প্রাণে ধন্য ধন্য রব উঠিল···সজ্জিত আসন-পংক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া গললগ্নীকৃতবাস-কুণ্ঠিত বিনয়াবনত সহদেবকে তাঁহারা স্মিত দৃষ্টির দ্বারা অভিনন্দিত করিলেন···

সহদেব যুক্তকরে নিবেদন করিল,—ব্রাহ্মণগণ উপবেশন করুন।

ব্রাহ্মণগণ উপবেশন করিলেন।

চারিদিক ঝক্‌মক্ করিতেছিল;—

শুভ্রবসন ব্রাহ্মণগণ আসনে উপবেশন করিতেই স্থানের ঔজ্জ্বল্য আরো বাড়িয়া গেল...

পরিবেশন সুরু হইল···শেষ হইল—থালার চতুর্দ্দিকে বাটি রেকাবীর আর অন্ত রহিল না—

দেখা গেল, ভোজনায়জনের গুজব যা' রটিয়াছিল তাহার একটি বর্ণ অতিরঞ্জিত বাএকটি অক্ষর অত্যুক্তি নহে।

ব্রাহ্মণগণ আচমন করিলেন—

পরস্পরের অনুমতি লইলেন; ভাতে হাত দিতে যাইবেন এমন সময় বৃদ্ধ কুমারদেব অধিকারী কুতূহলী হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—সহদেব অদ্ভুত-কর্ম্মা; কিন্তু তার চাইতেও অদ্ভুত ক্ষমতা তার যে রেঁধেছে। রেঁধেছে কে সহদেব?—প্রশ্ন করিয়া কুমারদেব প্রথমে সম্মুখস্থ পংক্তির দিকে পরে সহদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন···

সহদেব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিল—

সবিনয়ে আর সসম্ভ্রমে বলিল,—আজ্ঞে, রেঁধেছেন স্বর্গীয় অনুকুল বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের বিধবা। অন্নপূর্ণা তিনি—

গুণব্যাখ্যামূলক আরো কিছু বলিবার হয়তো সহদেবের ছিল, কিন্তু তার সময় সে পাইল না; মাঝখানে ছিট্‌কাইয়া উঠিলেন সাতকড়ি হালদার—

ঘাড় তুলিয়া সহদেবের দিকে চাহিয়া সাতকড়ি প্রশ্ন করিলেন,—কে? কে রেঁধেছে বল্‌লে? কার নাম কর্‌লে?

হালদারের প্রবল কণ্ঠের রুক্ষ আওয়াজ সভাস্থলে গম্ গম্ করিতে লাগিল...